আত্মার আলোকে ব্রহ্মলোকবাসী হইয়াছিলেন, জরা-মৃত্যু তাঁহার কি করিবে? অনেক পাঠ, অনেক চিন্তায় যে পরলোকতত্ত্ব আয়ত্ব হয় না, এই মৃত্যুঞ্জয় পুরুষের সম্মুখীন হইয়া একদিন অবলীলায় তাহা লাভ হইয়াছিল। মহর্ষির জরা মানবের জন্য আশার সমাচার প্রদান করিয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ, মতভেদ-পাশ। এই পাশ ছিন্ন করিতে না পারিয়া কত সাধু মহাত্মা নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহর্ষি এ পাশের অতীত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন মহর্ষি হইতে বিচ্ছিন্ন হন, তখন এক বিষম সময়। তাহাতে যে মহর্ষির হৃদয়ে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে আঘাত চিরদিনের জন্য দাগ বসাইতে পারে নাই। এই বিষম বিরোধও যে মহর্ষির মনকে একেবারে স্বস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই, ইহাতেই তাঁহার ঋষিত্ব অতি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ শেষ দিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। বাহিরের বিবাদ বিরোধের ধূম তাহা ম্লান করিতে পারে নাই। আমি মহর্ষির একখানা চিঠীর একাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই আমার কথা প্রতিপন্ন হইবে—

"আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ!

"৩০ আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরোনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

"আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি এমন আর কাহারও কাছে পাই না। তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি এখনও তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকট কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগবন্ধন হইয়াছিল; নানা প্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই।"

বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে আত্মাকে এ সকলের অতীত স্থানে রাখিতে সমর্থ হওয়াই ব্রাহ্মী-স্থিতির সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। মহর্ষি আত্মজ্ঞানের আলোকে এই স্থিতি পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা মহর্ষিজীবনে উপনিষদের একটী শ্লোকের সার্থকতা দেখিলাম; আর একটী শ্লোকের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য দেখাইয়া আমরা উপসংহার করিব। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে শ্লোকটির সঙ্গে মহর্ষির সম্বন্ধটা কিঞ্চিৎ অলৌকিক। কোথা হইতে একখানা গ্রন্থের পাতা তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া গেল, তিনি তাহা ধরিলেন এবং পণ্ডিতের দ্বারা অর্থ করিয়া লইলেন।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

জগতে যা কিছু আছে ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া লও। মহর্ষিজীবনে এ আদেশ কেমন পরিস্ফুট। পদ্মগন্ধে তিনি ভগবানের গাত্রগন্ধ অনুভব করিতেছেন, দাবানলে ভগবানের বহ্ন্যুৎসব অনুভব করিতেছেন, সমুদ্রতরঙ্গ দেখিয়া বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার পূর্ণিমার চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিতেছেন। কোমলে কঠোরে সর্ব্বত্রই ভগবানের লীলা অনুভব করিতেছেন। আবার নিজের আত্মার মধ্যে ভগবানকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। হিমালয়ে আদেশ হইল 'গৃহে ফিরিয়া যাও', আদেশ গ্রহণ করিতে একটু বিলম্ব হইল, কেন না, এরূপ আদেশের জন্য মহর্ষি প্রস্তুত ছিলেন না, আর সংসারে ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না। মহর্ষি এমনভাবে আপনাকে ব্রহ্মে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, যে এই একটু স্বাতন্ত্র্য আর সহ্য হইল না, সমস্ত প্রকৃতি যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, "দেখি যে হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়্ ধড়্ করিতেছে। আমার শরীরে এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল?" কিন্তু যেই আদেশ গৃহীত হইল, গৃহে ফিরিবার আয়োজন হইল,

অমনি সব ঠিক। মহর্ষি এমনই ভাবে আপনার ইচ্ছাকে ব্রহ্মের ইচ্ছার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন—"ঈশা বাস্য-মিদং সর্ব্বম্।" "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—কিরূপে বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম সম্ভোগ করিতে হয় তাহা মহর্ষিজীবনে কিরূপে প্রকটিত হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্"—সর্ব্বস্ব দিয়াও তৃপ্তি নাই, হাতে একটা আংটি ছিল, তাহাও দিলেন, বলিলেন, "যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না, যে সব দিলাম।—"মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্।" কোন্ কালে কোন্ অরণ্যে এই "ঈশাবাস্যং" মন্ত্ররূপ বীজ কোন্ ঋষিহৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল, আজ আমরা তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথরূপ ফুল-ফল-শোভিত সুন্দর বৃক্ষরূপে দেখিতে পাইলাম। কে জানে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া জল সিঞ্চনে সে বীজ কে সজীব রাখিয়াছিল। এই ভোগবিলাস-পিপাসু সভ্যতার দিনে মহর্ষিজীবন ভারত-বাসীর পক্ষে বিশেষ দান। ভগবান করুন, আমরা যেন তাঁহার এই অমূল্য দানের অপব্যবহার না করি। ওঁ স্বস্তি। *

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সাবিত্রী।

নিবিড় ঘোর বন,
আঁধার বিভীষণ,
শ্বাপদ গরজন
উতলা ;—
সাবিত্রী পতিকোলে,
ভাসিছে আঁখি-জলে,
বসিয়ে তরু-তলে
একলা !

স্খলিত দেহ-বাস,
স্খলিত কেশপাশ,
লুটায় ভূমিতলে
পবনে ;—
দয়িত মুখপানে,
চাহিয়ে একধ্যানে,
পলক নাহি পড়ে
নয়নে !
কখনো ধীরে ধীরে,
যতনে পতি-শিরে,
বাতাস করে বালা
আঁচলে ;—
কখনো দেহ 'পর
বুলায় কর কর,
কভু বা ধরি দেখে
কপোলে !
আলোড়ি' বুক তাঁর
উঠিছে অনিবার
দীরঘ শ্বাস, ভরা
বেদনা ;—
সতী যে পতি-রতা,
পরাণ পতি-গতা,
বাহ্যিক নাহি কোন
চেতনা !
মুনির বাক্য তবে,
সার্থক আজি হবে,—
বিধবা হবে আজি
সাবিত্রী ?
দুরন্ত কাল-গতি
ফিরায়ে আজি সতী,
মোহিবে চির তরে
ধরিত্রী !!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

---

* এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতাংশ সকল মহর্ষির আত্মচরিত হইতে গৃহীত

জাপানে পাশ্চাত্য জাতি।

রুশ-জাপানের প্রথম সম্পর্ক

প্রাচীন কালে জাপানকে অনেকগুলি পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল; রুশীয়গণও বাণিজ্যার্থে জাপানে আসিয়াছিল। কিন্তু প্রথমাবধিই দুই জাতির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একখানি জাপানী পোত ঝড়ে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া রুশ-উপকূলে উপস্থিত হইয়া চড়ায় আবদ্ধ হয়। রুশীয়গণ দয়াপরবশ হইয়া নাবিকদিগকে মুক্ত করতঃ অথোটস্ক নগরে লইয়া যায় এবং সেবা শুশ্রূষা দ্বারা ঝটিকাক্লিষ্ট পীড়িত জাপানী-দিগকে আরোগ্য করে। কিন্তু জাপানীদিগকে হাতে পাইয়া রুশ-রাজকর্ম্মচারীগণের মনে তাহাদের দ্বারা কিঞ্চিৎ স্বার্থোদ্ধার করিয়া লইবার ইচ্ছা উদিত হইল। তাহাদিগের ভাষা শিক্ষা ও তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব বৃদ্ধির জন্য রুশীয়গণ দশ বৎসর ঐ সকল জাপানীকে রুশ-রাজ্য পরিত্যাগ করিতে দিল না। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে রুশরাজ্ঞী ক্যাথেরিণ ঐ সকল জাপানী নাবিকের সঙ্গে বহু উপঢৌকন সহিত বাণিজ্যাধিকার লাভের জন্য জাপান সম্রাটের নিকট এক জন দূত প্রেরণ করিলেন। রুশ-জাপানের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন এই দৌত্যের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেই দৌত্য সম্পূর্ণ বৃথা হইল। জাপান রাজকর্ম্মচারীগণ বলিলেন—"আমাদের নাবিকদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তোমরা ধন্যবাদার্হ হইয়াছ বটে, কিন্তু তাহাদিগকে দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখিয়া তোমরা অতি অন্যায় কাজ করিয়াছ। যে সকল জাপানবাসী বিদেশে গিয়া বিদেশীদিগের সহিত সংস্রব স্থাপন করে, আমরা তাহাদিগকে আর জাপানে প্রতিগ্রহণ করি না। এই নাবিকদিগকে আর আমরা স্বদেশে গ্রহণ করিব না। ইহারা এখন আমাদের পক্ষে তোমাদেরই ন্যায় বিদেশী। ইহাদিগকে লইয়া তোমরা অবিলম্বে জাপান পরিত্যাগ কর। যদি কখন জাপানে আসিতে হয়, বিদেশীয়গণের জন্য বাণিজ্যার্থ নির্দ্দিষ্ট নাগাসাকি নগরে আসিবে।" সুতরাং ব্যর্থমনোরথ হইয়া রুশীয় রাজদূত জাপান পরিত্যাগ করিল। রাজ্ঞী ক্যাথেরিণ জাপানে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রুশরাজ আলেকজেণ্ডার এ বিষয়ে পুনরায় চেষ্টা আরম্ভ করিলেন। তিনি জাপানে দ্বিতীয় বার দূত প্রেরণ করিলেন। রিসানফ্ নামে এক ব্যক্তি এই দৌত্যের কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন। ইনি নিতান্ত অদূরদর্শী ও হঠকারী লোক ছিলেন। দেশাচার লইয়া প্রথমেই জাপানীদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। দেশীয় প্রথা অনুসারে অবনত হইয়া জাপানী রাজকর্ম্মচারীগণকে অভিবাদন করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল, তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইলেন। রুশীয় বাণিজ্য-দ্রব্য জাপানের ভূমিতে নামাইবার পূর্ব্বে দেশীয় নিয়মানুসারে তাঁহাকে নিরস্ত্র হইতে অনুরোধ করা হইল; তিনি সেই অনুরোধও পালন করিতে সম্মত হইলেন না। শাসনকর্ত্তা তখন আদেশ করিলেন, যে সম্রাটের অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত রুশীয়গণ জাপানে কোনরূপ ক্রয়বিক্রয় করিতে পারিবে না। অবশেষে একদিন রাজপ্রতিনিধি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। রিসানফ্ নানা উপঢৌকন সহিত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। অতি-সতর্ক জাপানীগণ রিসানফের গমন-পথ পরদা দ্বারা এমনি ভাবে আবৃত করিল, যে রাজপথ ব্যতীত আর কোন দ্রব্যই রুশীয়গণের দৃষ্টিগোচর হইল না। নগর মধ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল—'এক রুশীয় বণিক বাণিজ্য করিবার জন্য জাপানে আসিয়াছেন, তিনি রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, অতএব সকলে সতর্ক হও, আজ কেহ রাজপথে বাহির হইও না, কি জানি যদি তাঁহার কোন মন্দ অভিসন্ধি থাকে।'

রুশদূত বিস্মিত ও সন্দিগ্ধচিত্তে রাজপ্রতিনিধির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পরম সমাদরে রাজপ্রতিনিধি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু বাক্যকৌশল অবলম্বন করিয়া বাণিজ্য বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দিতে বিরত

রহিলেন। সাক্ষাতের পর তিনি ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পর রাজপ্রতিনিধির নিকট হইতে তিনি এই মর্ম্মে এক পত্র পাইলেন,—'বিদেশীয়দিগের সহিত বাণিজ্যসংশ্রবে আসিয়া আমরা নিতান্ত বিরক্ত হইয়াছি। জাপানবাসী বাণিজ্যার্থ বিদেশে যায় অথবা বিদেশীয়গণ আর এদেশে আসেন, আমরা কিছুতেই আর এই ইচ্ছা করি না। সুতরাং রুশীয়দিগের সহিত আমরা বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে অভিলাষী নহি। আপনারা আর কখনও এদেশে আসিবেন না।'—এই প্রকারে অপমানিত হইয়া রিসানফ্ ক্রোধে হতজ্ঞান হইলেন। কামস্কটকায় গমন করিয়া তত্রত্য রুশীয়গণকে এই অবমাননার প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করিয়া তিনি রুশসম্রাটের নিকট যাত্রা করিলেন, কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কামস্কটকাবাসী রুশীয়গণ দুইখানি জাহাজ লইয়া জাপানের অধীনস্থ কিউরাইল দ্বীপে উপস্থিত হইয়া বহুলোকের প্রাণনাশ করিল, অনেক অর্থ লুণ্ঠন ও প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিল এবং অনেক গণ্যমান্য লোককে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।

জাপান-সম্রাট ক্রোধে অগ্নিপ্রায় হইলেন। কিন্তু এই অত্যাচার রুশসম্রাটের অনুমোদন অনুসারে হইয়াছে কি না বুঝিতে পারিলেন না। প্রকৃত পক্ষে রুশ-সম্রাট এই অত্যাচারের বিষয় কিছুই জানিতেন না। সেই সময়ে রেল টেলিগ্রাফ বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংবাদ চলাচলের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। সুতরাং সন্দেহ দূর করিবার কোন সহজ উপায় ছিল না। কিছুদিন পরে রুশরাজ কাপ্তান গোলোইন নামক আর এক ব্যক্তিকে জাপানে প্রেরণ করিলেন। জাপানের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপনই এই দৌত্যেরও অভিপ্রায় ছিল। রুশীয় জাহাজ উপস্থিত হইবা মাত্র ক্রুদ্ধ জাপানীগণ তাহা বেষ্টন করিল এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, অরক্ষিত কিউরাইল দ্বীপবাসীদিগের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল এই বারও সেই জন্যই আসিয়াছে কি না। জাহাজখানা অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া তাহারা গোলোইন ও তাহার সঙ্গীদিগকে বন্দী করিয়া জাপান সম্রাটের নিকট লইয়া গেল। রুশিয়গের জাপানে বাণিজ্যাধিকার লাভের আশা নির্ম্মূল হইল।

আদর্শ দাম্পত্য-জীবন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ—সেবার উদ্যোগ।

রাজগৃহ হইতে বাঁকিপুর ফিরিবার কিছুকাল পরেই উড়িষ্যার শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও তোমার আতিথ্য স্বীকার করিলেন। তোমার গৃহখানি দেখিয়া বলিলেন, "এই তো তীর্থ। গয়া কাশী ঘুরিয়া আসিলাম, এমন তীর্থ তো আর কোথাও দেখি নাই।" রাওজী প্রাতঃকালে উপাসনায় বসিয়াছেন, উপাসনার পরেই গয়া যাত্রা করিবেন। যাত্রার সময় প্রাতঃকাল ৭টা। এই সময়ের মধ্যে উপাসনার পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছু না জানাইয়া রান্না আরম্ভ করিয়া ভৃত্যকে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলে, যে আহার প্রস্তুত হইলে তাহার প্রতি যেন দৃষ্টি রাখে। যেমন উপাসনা হইল, অমনি আহারের স্থান প্রস্তুত হইল, ওদিকে ঘোড়ার গাড়ীতে দ্রব্যাদি উঠিতে লাগিল। বন্ধু রাওজী আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আহারে বসিলেন। তাঁহার সন্তোষ দেখিয়া আমরা কত কৃতজ্ঞ হইলাম। তোমার আতিথ্যে সরলতা ও আদর মিশান থাকিত বলিয়া সে আতিথ্য গ্রহণে কাহারও সঙ্কোচ হইত না।

আধ্যাত্মিক বিবাহের পর নানা ভাব হৃদয়ে লইয়া আমরা আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। তুমি করিবে কি? দেবকন্যা, স্বর্গের ধন লাভ করিয়াছ, কিরূপে অপরকে দিবে, পরস্পরে এ আলোচনা করিতে লাগিলাম। যাহা লাভ করিলে, অন্যে যদি তাহার অংশ না পায়; তোমার পাওয়া ত সার্থক হয় না। ভাবিতে ভাবিতে তোমার "পরিবারের" সূত্রপাত হইল। তখন জানিতাম না যে উহার নাম "পরিবার" হইবে।

মোকামার ভাই অপূর্ব্বকৃষ্ণের বাড়ীকে তুমি আপনার বাটী মনে করিতে। তেমনি দানাপুরের ভাই ষষ্টিদাসের বাড়ীকে পশ্চিমের ঘর বলিতে। এইবার তুমি একবার তোমার পূর্ব্বের ঘরে গিয়া দেখিলে, যে সেখানে খেলাত

বাবুর কন্যা সুকুমারীর লেখা পড়া হইতেছে না। পশ্চিমের ঘরেও সেই অবস্থা; ভাই ষষ্টিদাসের কন্যার ক খ শেখা হইয়াছে মাত্র। নারীর অজ্ঞানতা তোমার এত ভয়ানক বোধ হইত, যে তাহা দেখিয়া কখনই তুমি স্থির থাকিতে পারিতে না। গরীব ব্রাহ্মদিগের পক্ষে কলিকাতায় কন্যাদের রাখিয়া লেখা পড়া শেখান এক প্রকার অসম্ভব। তুমি বুঝিলে এ মেয়ে দুটীর জ্ঞানাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে। তুমি বলিলে, বাঁকিপুরে নিজ বাটীতে বোর্ডিং খুলিবে। তাহাই হইল।

২৮শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে বোর্ডিং স্থাপিত হইল। এই দুই কন্যাকে লইয়া নিজে শিক্ষাদান কার্য্য আরম্ভ করিলে। কিন্তু এ শিক্ষাদানের কায আর গৃহস্থালী নয়, রান্না বান্না নয়, যে পিতামাতার বা আত্মীয় স্বজনদিগের নিকট হইতেই ইহার সমুদয় প্রণালী অবগত হইবে। ভিন্ন পরিবারের কন্যাদের একত্র রাখিতে হইলে কি কৌশলে রাখিতে হয়, সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দিন কয়েক পরিশ্রম করিয়াই বুঝিলে, যে এই কার্যটী সুন্দররূপে সম্পন্ন করিবার জন্য হৃদয়মনের বিশেষ বিকাশ ও চরিত্রের বিশেষ সাধন প্রয়োজন। তাই স্থির করিলে, কিছুকালের জন্য লক্ষ্ণৌ নগরীস্থিত Miss Thoburnএর প্রতিষ্ঠিত Women's collegeএ যাইবে, এবং সেখানে ছাত্রীরূপে শাসনাধীন থাকিয়া কন্যাদের কিরূপে চালাইতে হয় তাহা শিক্ষা করিবে; আর যদি সম্ভব হয়, কিছু ইংরাজীও শিক্ষা করিবে।

কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা একজন বয়স্কা সন্তানবতী গৃহিণীর পক্ষে সহজ নয়। তুমি স্বামীর এত আদরের বস্তু, পাঁচ সন্তানের মাতা, চারিজন দাসদাসীর উপরে কর্ত্রী। তোমাকে এ সকল ছাড়িয়া অপরের কন্যার শিক্ষার জন্য গৃহত্যাগ করিতে হইবে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের নিয়মাধীন হইয়া চলিতে হইবে; সেখানে স্বদেশবাসী অপর ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার সঙ্গে থাকিতে পাইবে না, হয়তো ব্রাহ্মসমাজেও যাইতে পাইবে না। এ সকল জানিয়া শুনিয়াও উন্মাদিনীর মত দূর দেশে চলিলে। যাইবার সঙ্কল্প করিবার সময়, তোমার গৃহের তত্ত্বাবধান কে করিবে সেজন্য তোমার আশঙ্কা হইল না। কোথা হইতে এত খরচ আসিবে, তাহারও ভাবনা করিলে না। গৃহে দ্বিতীয় এমন কোন বয়স্কা নারী ছিলেন না, যিনি তোমার অনুপস্থিতিতে সন্তানদিগের আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতে পারেন। মাসিক আয়ে তখনই সচ্ছল ভাবে ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না, তোমাকে বিদেশে সভ্য মেমদিগের মধ্যে থাকিতে হইলে কত খরচ হইবে, সে খরচ কোথা হইতে আসিবে, তার জন্যও একটুমাত্র চিন্তিত হইলে না, কোনও বাধা তোমায় বাধা দিতে পারিল না। তোমার এই যাত্রার প্রস্তাব শুনিয়া কেহ হাসিলেন, কেহ আশ্চর্য্য হইলেন। যাঁহারা জানিতেন তোমার উদ্দেশ্য কি, তাঁহারা সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সহানুভূতির দ্বারা এবং কার্য্যতঃ তোমার এই সঙ্কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ মিলিত জীবনে যে তুমি নিত্য আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতে, যে তুমি কি রাজধানীতে, কি গ্রামে, কি কার্য্যক্ষেত্রে, কি উৎসবে, নিরন্তর আমার ছায়ার মত সঙ্গে ছিলে, কখনও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিতে না, সেই তুমি আজ কত দিনের জন্য কত দূরদেশে চলিলে! বনের পাখী অনেক দিন পোষা পাখী হইলে সে কত প্রিয় হয়! তুমি পরের মেয়ে আমাদের ঘরে আসিয়া আপনার গুণে সকলকে মোহিত করিয়াছিলে। তোমাকে দূরদেশে পাঠান আমার পক্ষে কত কঠিন ছিল, তাহা তুমি জানিতে। কিন্তু এখন তুমি আর শুধু আমার নও। আমার জন্য তোমাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলাম না; উড়াইয়া দিয়া, উড়িতে দিয়া, আক্ষেপ করিলাম না; উড়িতে গিয়া তুমিও আক্ষেপ করিলে না। দেবি, এই কি আমরা সেই দুজন, যাহারা বিদায় লইতে হইলে পূর্ব্বে নিরাশ্বাস হইয়া ক্রন্দন করিতাম? এবার অশ্রুজল কোথায় গেল? ব্রহ্ম কৃপাতেই ইহাও সম্ভব হইল। হাসিমুখে আমরা বিদায় লইলাম। * * *

অদৃষ্ট-লিপি।*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি সুদূর সিলন হইতে কলিকাতা আসিতেছিলাম। কলিকাতা হইতে আবার দার্জ্জিলিংএ যাইতে হইবে। আমার সহিত আর আমার আত্মীয় স্বজন কেহ ছিল না। আমি সিলন হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত জাহাজেই আসিতেছিলাম। জাহাজে একজন সহযাত্রিনীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, তিনি অতিশয় সরল। তাঁহার সাজসজ্জার কোন আড়ম্বর ছিল না। এমন ধীরে কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাঁহার মুখে এমন গম্ভীরতার ছায়া প্রভাসিত হইয়া থাকিত যে, স্বভাবঃতই আমার চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল।

আমার সহযাত্রিনী আমা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। আমরা এক ক্যাবিনেই থাকিতাম। পরিচয়ে জানিলাম তাঁহার নাম "মিসেস্ দত্ত"। তাঁহার স্বামী ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে কায করেন। সম্প্রতি তাঁহার দুইটি সন্তান সুদূর ইংলণ্ডে গমন করিয়াছে, তিনি তাহাদের সহিত বোম্বাই পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। রেলের যাত্রা তিনি পছন্দ করেন না, সেইজন্য জাহাজে করিয়াই কলিকাতায় ফিরিতেছিলেন। আমাদের জাহাজে আর কোনও বাঙ্গালী মহিলা ছিল না, সেইজন্য আমাদের ঘনিষ্টতা হইতে বিলম্ব হইল না।

আমরা উভয়েই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া জাহাজের ডেকে গিয়া বসিতাম, উভয়ে প্রত্যহ প্রভাতে সূর্য্যোদয় ও সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত দেখিতাম। সূর্য্য উঠিবার পূর্ব্বে কেমন কোমল অরুণবর্ণে পূর্ব্বদিক অনুরঞ্জিত হইত, তাহার পর ধীরে ধীরে রেখায় রেখায় কেমন সূর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইত। সেই অসীম নীল আকাশের তলে, অসীম নীল জল, তাহার মাঝখানে ক্ষুদ্র রত্নাঙ্গুরীর রত্নের মত সূর্য্য ঝলসিত হইয়া উঠিত। সেই সন্ধ্যার সূর্য্যাস্ত কেমন মধুর, হৃদয় যেন কি এক অজানিতভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিত। সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি নিভিয়া আসিয়াছে, আর সে সূর্য্যের প্রতি চাহিতে চক্ষু ঝলসিত হয় না। পশ্চিম গগন কেমন রাঙা বর্ণে রঞ্জিত হইত, চারিদিকে অপরূপ চিত্র, রামধনুর রংএর মত মেঘের সমাবেশ, নীল জলতলে সূর্য্যের ছায়া পড়িয়া জলের কি অপূর্ব্ব রূপ। জলে ও আকাশে যেন মিশিয়া এক হইয়া গেছে। সহসা যেন সেই নীল তরঙ্গের মধ্যে সূর্য্য মিলিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় ডেকের এক কোণে আমরা দুইজনে বসিয়াছিলাম, মিসেস্ দত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মিস্ বসু, তোমার নাম কি?"

আমি বলিলাম, "মণিকা"।

তিনি বলিলেন, "আর আমি তোমায় আপনি বলিতে পারি না। এবার থেকে তোমায় মণিকা বলেই ডাক্‌ব। আর অত খাতির ভদ্রতা চলে না।"

আমি বলিলাম, "আপনি যে আমায় এত স্নেহ করেন ইহাই আমার সৌভাগ্য।"

"আচ্ছা তুমি ত একা ক'ল্‌কাতা চলেছ, সঙ্গে কেবল ঐ বুড়ী দাসী, তোমায় ভাবী স্বামীর সঙ্গে ক'ল্‌কাতায় দেখা হবার কথা?"

"তিনি লিখেছেন ত নিতে আসবেন।"

"মণিকা, তুমি যদি রাগ না কর ত একটা প্রশ্ন করি।"

"অনায়াসে। তা'তে কিছু আমার রাগ হবে না।"

"তোমার এমন অদ্ভুত রকমে বিবাহ হচ্ছে কেন?"

"আমার মামী বলিলেন, 'তুমি কলিকাতা পর্য্যন্ত একা যাও, সুরেশ তোমায় কলিকাতা পর্য্যন্ত এসে দার্জ্জিলিংএ নিয়ে যাবে। সেখানে সুরেশের দিদি মিসেস্ বসু আছেন, সেই স্থান হ'তে বিবাহ হবে।' সুরেশ দার্জ্জিলিংএর নিকটে এক চা বাগানের ম্যানেজার।"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন "চা বাগানের ম্যানেজার? তুমি কি সুরেশকে ভালবাস?"

আমি বলিলাম, "সে সব অনেক কথা, সুরেশের বাবা ও আমার মামা দুজনে মিলিয়া একত্রে সিলনে যান, ও সেইখানে ব্যবসা ইত্যাদি করিয়া বাস করেন। আমার অতি শৈশবে আমার পিতার মৃত্যু হয়, মা মামার

* একটি ইংরাজী গল্পের ছায়ানুভাসে লিখিত।

বাটীতে আমায় লইয়া ছিলেন। আমি যখন বার বৎসরের ছিলাম তখন আমার মার মৃত্যু হয়। মামা ও আজ দুই বৎসর হ'ল আর নাই। মামা আমায় কনভেণ্টে রাখাইয়া বেশ সুশিক্ষাই দিয়াছিলেন। মামার পরলোক গমনের পর মামীমার আর সে প্রকার ভাব নাই, তাঁহারও দুটি মেয়ে, একটি আমার চেয়ে কিছু বড়, অন্যটি ছোট। তাঁহারা সিলনের ঘর দ্বার উঠাইয়া চলিয়া আসিতে চান। কলিকাতায় থাকিবার ইচ্ছা, কিন্তু কার্য্যে কতটা পরিণত হইবে তা জানি না। আমি তাঁহাদের সংসারে থাকিলে তেমন সুবিধাও নাই তাই—"

মিসেস্ দত্ত হাসিয়া বলিলেন, "তাই এত শীঘ্র বিবাহের ঠিক হইয়া গেল, কেমন? আচ্ছা তুমি কি সুরেশকে বেশ ভাল করিয়া জান?"

"হাঁ জানি বই কি, আমার মামার বাটীর পাশেই তাঁদের বাটী, একত্র আমরা খেলা ধূলা করেছি। তবে অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখি নাই।"

" কত দিন? তোমার এখন বয়স কত?"

"সাত আট বছর দেখি নাই, আমার এখন কুড়ি বছর বয়স চল্‌ছে।"

"তার মধ্যে সাত আট বছর দেখনি, তা'হলে বার বছর বয়স থেকে দেখনি, তবু ভালবাসা হল?"

"সুরেশের মা-ও ত এই বিবাহ দেবার জন্য একান্ত উৎসুক হয়েছেন। গত বৎসর আমার দুই মামাতো বোনের সঙ্গে আমারও ছবি তোলা হয়। সুরেশের মা বলেন, সেই ছবি দেখে সুরেশ আমায় খুব পছন্দ করেছেন। তার পর সুরেশ আমায় একটা পত্র দেন, আমিও উত্তর দি। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই সরল চিঠিপত্র ভালবাসার কথায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল, আমি বড়ই বিপদে পড়িলাম। আমার মামীমা ও সুরেশের মা এই বিবাহের জন্য আমায় অস্থির করে তুলেছিলেন। তবু আমি সুরেশের সেই প্রণয়পত্রের ও বিবাহের প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইব স্থির করিয়াছিলাম, এমন সময়—"

"এমন সময়ে কি?"

আমি মুখ নত করিয়া লজ্জিত কণ্ঠে কহিলাম "সুরেশের ফটো আসিল।"

"তুমি সেই ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইলে?"

"হাঁ, আমি মনে মনে জানিলাম, যে ইঁহাকে আমি ভাল বাসিতে পারিব, ও সেই ফটো দর্শনেই ভাল বাসিয়াছি।"

মিসেস্ দত্ত আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আচ্ছা চল, তোমার সেই ফটো দেখি, তা'হ'লে জানিব, তোমার প্রেম কিরূপ পাত্রে সমর্পিত হয়েছে।" আমরা উভয়ে ক্যাবিনে প্রবেশ করিলাম। বিদ্যুতালোকে গৃহ আলোকিত।

আমার বাক্সের মধ্য হইতে সেই মোরোক্কো-মণ্ডিত ফ্রেমে সযত্নে রক্ষিত চিত্রপট খানি বাহির করিয়া দিলাম। মিসেস্ দত্ত অতিশয় মনোযোগের সহিত সেই সুন্দর সুকোমল মধুর ভাবপূর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই আয়ত উজ্জ্বল সরল নয়নের দৃষ্টি, সেই উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাটে চূর্ণ কুন্তলের শোভায় তাঁহার মুখও সহাস্য হইল। তিনি হাসিয়া আমার প্রতি ফিরিয়া কহিলেন,—

"হাঁ সুপাত্র বটে, এঁর হাতে পড়িয়া তুমি সুখী হবে, তুমি ধন্য হবে। ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।"

আমাদের জাহাজ ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া উপনীত হইল। জাহাজ যত জেটির নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল আমার হৃদয় ততই আনন্দ আবেগে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এখনি সেই মুখ দেখিব, সেই স্নিগ্ধ মধুর চাহনিতে এখনি আমার প্রাণ জুড়াইবে। আমার অতৃপ্ত জীবনে কখনো ভালবাসার সাধ মিটে নাই, শৈশব হইতেই সব ফুরাইয়া গেছে। আজ আমার প্রণয়-বিকশিত হৃদয় লইয়া পতিদেবতাকে বরণ করিতে একান্ত ব্যগ্র হইলাম। জাহাজ থামিল, আমি মনে মনে অতিশয় সশঙ্কিত লজ্জিত হইয়া,সেই দুইটি আয়ত প্রশান্ত নয়নের সুমধুর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির আশায় চাহিলাম, কই কেহ ত কোথাও নাই! তার পর চারিদিকে চাহিলাম, কেহ কোথাও নাই, কেহ আমায় অগ্রসর হইয়া লইতে

আসিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ দত্ত আসিয়া বলিলেন,—

"মণিকা তোমার ভাবী স্বামী কই? আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দাও।"

আমি ম্লানমুখে বলিলাম, "কই কেহ ত আসেন নাই।"

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি তুমি কলিকাতায় কোথায় থাকিবে?"

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন "আচ্ছা এসো, মিঃ দত্ত এসেছেন, তাঁকে সব বল্‌লেই ঠিক হয়ে যাবে।" নিরাশার মাঝখানে আমি আশার আলো দেখিলাম, জলমগ্ন ব্যক্তির কূল পাইবার মত আমার কূল মিলিল। এই বিশ্বসংসারে আমি একাকী, সহায়হীনা, আমি কোথায় যাইব তাহা ভাবিবার ক্ষমতা আমার ছিল না।

আমরা জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছি, এমন সময় একজন ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া একখানি পত্র দিল। শিরোনামায় দেখিলাম সুরেশের লেখা, তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখিলাম নিম্নলিখিত কথা লেখা আছে।

"প্রিয়তমে!

আমার শরীর একান্ত অসুস্থ। আজ সপ্তাহাবধি শয্যাগত আছি, সেই জন্য আমি নিজে যাইতে পারিলাম না, আমার দিদির সরকারকে পাঠাইলাম। সে তোমায় নিরাপদে দার্জ্জিলিংএ আনিবে। তুমি বরাবর ষ্টেসনে আসিয়া ওয়েটিংরুমে অপেক্ষা করিও, তারপর সেই দিনই দার্জ্জিলিং মেলে চলিয়া আসিও। আমি যেমন করিয়া পারি, শিলিগুড়িতে তোমার সহিত মিলিত হইব। এখানেই তবে বিদায়।

তোমারি একান্ত সুরেশ।"

আমি পত্র পাইয়া সুস্থির হইয়া নিশ্বাস ফেলিলাম। মিসেস্ দত্তকে বলিলাম, ষ্টেসনে যাইব, তিনি তাহাতে কোনমতে মত দিলেন না। আমায় সাদরে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। বিদেশে তাঁহার যত্ন অতুলনীয়, আমি তাঁহার ঋণ কখনো শুধিতে পারিব না। তিনি আমাকে ট্রেণে তুলিতে তাঁহার স্বামীর সহিত ষ্টেসনে আসিলেন। মিসেস্ বসুকে ষ্টেসন হইতে টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন, যে আমি তাহার পরদিন দার্জ্জিলিংএ পঁহুছিব। আমি রেলে চড়িবার পর তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "মা, তোমায় দেখিয়া কি জানি কেন এত স্নেহ হইতেছে, তুমি যদি সেখানে গিয়া কোনও বিপদে পড়, যদি তুমি যাহা মনে করিয়া যইতেছ তাহা না দেখ, তা'হ'লে তুমি আমার নিকট চলিয়া আসিও। আমার সন্তান দুটি এখন বিলাতে চলিয়া গেছে, আমি একাকী আছি; কন্যাস্নেহে আমি তোমাকে আমার গৃহে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইব।" ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, আমার চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। অপরিচিতাকে কে এত স্নেহ আদর করে? যে নিতান্ত নিরাশ্রয় তাহার প্রতিও জগদীশ্বরের অযাচিত করুণা সমভাবে বর্ষণ হইতেছে। আমাদের বুঝিবার কোন সাধ্য নাই।

আমার সঙ্গে যে বুড়ী দাসী আসিয়াছিল সে সেই জাহাজেই ফিরিয়া যাইবে, পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল। সে জাহাজেই রহিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

ব্রহ্মাণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রহাদিতে জীব আছে কি?

সৌর জগতের গ্রহগুলির অবস্থা কিরূপ? আমাদের পৃথিবীর ন্যায় উহারাও কি জীবের আবাস ভূমি? গ্রহাদির অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু উহাদের ভিতরে জীবের বাস আছে কি না, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সহজ নহে। গ্রহগণের অবস্থা অতিশয় বিভিন্ন। সুতরাং এক গ্রহের অবস্থা অন্য গ্রহের উপযোগী জীবের বাসের অনুকূল না হইতে পারে। কিন্তু সেখানকার যেরূপ অবস্থা, তাহার উপযোগী জীব সৃষ্টি করা ভগবানের পক্ষে

কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। কিরূপ অবস্থা জীবের অনুকূল, কিরূপ অবস্থা প্রতিকূল, তাহার বিচার করিবার যোগ্য আমরা নহি। কারণ, এই পৃথিবীর জীবগণের পক্ষে কোন্ অবস্থা অনুকূল, কোন্ অবস্থা প্রতিকূল, তাহারই সংবাদ আমরা রাখি না। যেখানে জীব থাকিবার কোনও সম্ভাবনা মনে করা যায় নাই, সেখানেও নানারূপ জীব আবিষ্কৃত হইতেছে। গভীর সমুদ্রের তলায় চাপ এরূপ ভয়ঙ্কর যে, লোকে মনে করিত এত চাপের মধ্যে জীব থাকা অসম্ভব। কিন্তু সেখান হইতেও আশ্চর্য্য জীব সকল বাহির হইয়াছে। তথায় চির অন্ধকার, তাই সে সকল জীব অন্ধ। কারণ, তাহারা চক্ষু দিয়া কি করিবে? তাহাদের শরীরের গঠন সেই ভয়ানক চাপেরই উপযোগী। তাহাদিগকে উপরে তুলিয়া আনিলে তাহারা ফাটিয়াই মরিয়া যায়।

গ্রহগণের মধ্যে, মঙ্গলের অবস্থা, জলবায়ু, ঋতু পরিবর্ত্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে, অনেকটা পৃথিবীর অনুরূপ। সুতরাং অনেকেই মনে করেন যে, পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলেও জীব থাকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও গ্রহের অবস্থা পৃথিবীর অনুরূপ নহে। বুধ ও শুক্র, সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, অতিরিক্ত রূপ গরম হওয়ারই সম্ভাবনা। বৃহস্পতির অবস্থা যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে উহাতে বাষ্পের ভাগই বেশী বলিয়া মনে হয়। উহার অপেক্ষাকৃত সামান্য ওজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, ইহাই সন্দেহ হয় যে, ঐ গ্রহ এখনও ভাল করিয়া জমাট বাঁধিতে পারে নাই। উহা এখনও অগ্নিময় থাকারই সম্ভাবনা। সূর্য্যের চাইতে অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পৃথিবীর অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে নাই।

শনি, ইউরেনস্ এবং নেপ্‌চুন, ইহাদিগকে মোটের উপরে বৃহস্পতিরই সঙ্ক্ষিপ্ত সংস্করণ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক, আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে এসকলকে তেমন বাঞ্ছনীয় স্থান বলিয়া মনে হয় না। কালে উহারা আরও ঠাণ্ডা হইয়া, পৃথিবীর মত অবস্থায় আসিতে পারে। কিন্তু তখন আবার ইউরেনস্ আর নেপ্‌চুন, সূর্য্য হইতে দূরে থাকায়, এত ঠাণ্ডা হইবে যে, আমাদের সেখানে বাস করা সম্ভবই হইবে না। তবে, অবশ্য সেখানে সেখানকার উপযোগী জীব সকল উৎপন্ন হইতে পারে, এবং হয়ত আছে। জগতটা ত কেবল আমাদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সুতরাং সকল স্থানেই আমাদের হিসাব খাটাইলে চলিবে কেন?

এস্থলে একটা অতি আশাজনক সংবাদ আছে। আমরা চিরকালই শুনিয়া আসিয়াছি যে, চন্দ্রে জীবের বাসের উপযোগী কিছুই নাই। উহা জীবনের সংশ্রবশূন্য ভয়ঙ্কর শ্মশান। মাঝে মাঝে কেহ কেহ অন্য কথাও না বলিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু তাঁহাদের কথা কেহ গ্রাহ্য করে নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি অধ্যাপক পিকারিং বলিয়াছেন যে, তিনি চন্দ্রে তুষার, কুয়াসা এবং গাছ-গাছড়া প্রভৃতি থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সৌরজগতের যেটুকু পরিচয় দেওয়া হইল, আপাততঃ আমাদিগকে ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আমাদের যে ব্রহ্মাণ্ডের খবর লওয়া চাই, সুতরাং ঘরের কাছে এত বিলম্ব করিলে চলিবে কেন? তবে আসুন একবার সাহস করিয়া করিয়া বাহির হইয়া পড়ি।

সৌর জগতের বাহিরে অনন্ত আকাশ, আমরা কোন্ দিকে যাইব। অন্ততঃ আমাদের দিকভ্রম না হয়, তজ্জন্য আকাশের মোটামুটি কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বেই লওয়া আবশ্যক। আকাশে তারাগুলি আপাততঃ দেখিতে যদিও নিতান্ত এলোমেলো, তথাপি ইচ্ছা করিলে, উহারই মধ্যে চিনিবার উপযুক্ত দু একটা স্থান বাহির করা যায়। কালপুরুষ, অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে ওরায়ন বলে; কৃত্তিকা, ইংরাজীতে যাহাকে প্লিয়াডিক্ বলে; সপ্তর্ষি মণ্ডল, ইংরাজীতে যাহাকে গ্রেট্‌বেয়ার (Ursa Major) বলে,—এসকলের কথা প্রায় সকলেই জানেন। সপ্তর্ষি মণ্ডলের দুটি তারার সাহায্যে, কেমন করিয়া ধ্রুবতারা বাহির করিতে হয়, তাহাও অনেকের জানা আছে। তারপর, যাহাকে ছায়াপথ (Milky Way) বলে তাহার কথা, অন্ততঃ প্রত্যেকেরই জানা উচিত; কারণ উহাই আমাদের পরিদৃশ্যমান জগত। আর আমরা এই ছায়া পথেরই অধিবাসী।

খুব পরিষ্কার অন্ধকার রাত্রিতে আকাশের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলে পাতলা মেঘের রেখার ন্যায় একটা জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকেই আমাদের দেশে ছায়াপথ, যমের জাঙ্গাল, আকাশগঙ্গা, স্বর্ণদী প্রভৃতি নাম দিয়াছে। ব্রাহ্মণের শরীরে যেমন পৈতা শোভা পায়, সেইরূপ পৈতার আকারে, ছায়াপথ আকাশের দেহ বেষ্টন করিয়া আছে। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে, উহাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার সমষ্টি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তারাগুলি কোথাও দলবদ্ধ হইয়া, পুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে, কোথাও আকাশে ছড়ান রহিয়াছে। ছায়াপথের তারাগুলি এত ঘন এবং ছোট ছোট যে দূরবীক্ষণ ভিন্ন উহাদিগকে পৃথকরূপে দেখা সম্ভব নহে। তাই আমরা মোটের উপরে ঐ স্থানে একটা আলোকের ধারামাত্র দেখিতে পাই। ছায়াপথের বাহিরেও অনেক তারা আছে, সেগুলি বড় বড়ও বটে। কিন্তু বড় বড় তারার অধিকাংশই ছায়াপথের ভিতরে অথবা খুব নিকটে। ছায়াপথ হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, তারা অথবা তারাপুঞ্জের সংখ্যা ততই কমিয়া আসে। কিন্তু নীহারিকার সংখ্যা বাড়ে। ছায়াপথ আকাশের যে স্থান বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাকে যদি আকাশের মধ্যদেশ ধরা যায়, তবে দেখা যায় যে, আকাশের দুই প্রান্তে নীহারিকাদের প্রধান স্থান। মধ্যদেশে তারা এবং তারাপুঞ্জ। এই ঘটনাটী আকস্মিক বলিয়া মনে হয় না। ইহা দ্বারা মনে হয়, যেন এই দৃশ্যমান জগতের অংশ সকলের ভিতরে একটা শৃঙ্খলা, সুতরাং একটা নিগূঢ় যোগ আছে। ভগবান এই ব্রহ্মাণ্ড উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলো ভাবে সৃষ্টি করেন নাই। ইহার ভিতরে একটা বিরাট উদ্দেশ্য এবং একত্ব আছে।

ছায়াপথ।

যাহা হউক আমাদের কাযের কথা বলি। পৃথিবী যে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে, একথার উপরে সন্দেহ করিয়া টাইকোব্রাহি বলিয়াছিলেন, "তবে নক্ষত্রগণের দিকের পরিবর্ত্তন হয় না কেন?" কোপার্ণিকাস এই আপত্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন যে,—"পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই হয়। কালে তাহা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু এই কথা প্রমাণ করিতে হইলে, যেরূপ উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি এবং সূক্ষ্ম পরিদর্শনের আবশ্যক হয়, সে সময়ে তাহা ছিল না। এ সকল বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, তেমন উন্নতি লাভ হয় নাই। সুতরাং তাহার পূর্ব্বে এ বিষয়ে কেহ কৃতকার্য্যও হন নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে, বেসেল নামক জার্ম্মান দেশীয় পণ্ডিত, প্রথমে সিগ্‌নাস্ নামক নক্ষত্রমণ্ডলের ৬১ নম্বর তারাটীর দিকের এইরূপ পরিবর্ত্তন নিরূপণ করিয়া, তাহার দূরত্ব মোটামুটি ঠিক করিতে সমর্থ হন। মোটামুটি শব্দ এইজন্য ব্যবহার করিতেছি যে, এ কার্য্যের মতন সূক্ষ্ম ও কঠিন কায আর অতি অল্পই আছে। অতি সামান্য ভুল হইলেও, লক্ষ কোটি মাইলের তফাৎ হইয়া যায়। অথচ ভুল হইবার কারণ অনেক বর্ত্তমান। এমত অবস্থায়, মোটামুটি ভিন্ন, কোনরূপ সূক্ষ্ম উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যে অসম্ভব, একথা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। এমন কি, এরূপ কঠিন প্রশ্নের উত্তর যে কেহ বাহির করিতে পারিয়াছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হয়।

নক্ষত্রের দূরত্ব।

অতি অল্প সংখ্যক তারার স্থলেই এরূপ উত্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যে সকল স্থলে, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গণনার ফলের মধ্যে, ঐক্য দেখা গিয়াছে, তাহার সংখ্যা পঁচিশের অধিক হইবে না। ইহাদের মধ্যে, আমাদের নিকটতম দশটি তারার দূরত্ব কিরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া গেল। এই সকল দূরত্বের উল্লেখ করিতে হইলে, মাইল, ক্রোশ ইত্যাদি নাম ব্যবহার করা বড়ই অসুবিধাজনক হইয়া উঠে। কারণ, তাহাতে অঙ্কের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, তাহা পাঠ করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। এজন্য পণ্ডিতেরা মাপকাঠি বড় করিয়া লইয়া কাযের সুবিধা করিয়াছেন। মাইল, ক্রোশ ইত্যাদির দ্বারা না মাপিয়া, আলোক এক বৎসরে যতদূর যায়, সেই দূরত্বকে তাঁহারা মাপকাঠি করিয়াছেন; এবং তাহার নাম রাখিয়াছেন "আলোক-বর্ষ" (light year)। এক আলোকবর্ষের পরিমাণ, ৫৮ নিখর্ব্ব ৮৩ বৃন্দ ৩৯ কোটি ৭০ লক্ষ ১৬ হাজার মাইল। আমাদের সর্ব্ব

আলোক বর্ষ।

নিকটবর্ত্তী দশটি তারার নাম এবং তাহাদের দূরত্ব এইরূপ—

নিকটতম দশটি নক্ষত্র।

আল্‌ফা সেণ্টরি—সাড়ে চার আলোক বর্ষ, ৬১ সিগ্‌নি—৭·৪ আলোকবর্ষ, সিরিয়াস্—৮·৮ আলোকবর্ষ, প্রোসায়ন—১১·৬ আলোকবর্ষ, ক্যাপেলা—১৫·৫ আলোকবর্ষ, আল্টেয়ার—১৬·৩ আলোকবর্ষ, বিটা ক্যাসিও পিই—২০·৪ আলোকবর্ষ, বেটেলগিউস্—২১·৭ আলোকবর্ষ, ভেগা—২১·৭ আলোকবর্ষ, ধ্রুবতারা—৪৬·৫ আলোকবর্ষ।

দেখা যাইতেছে যে, আমাদের নিকটতম যে তারাটি, তাহাও ৪½ আলোকবর্ষ দূরে। মাইলের সংখ্যায় প্রকাশ করিলে, ৪½ আলোক বর্ষে, ২ পদ্ম, ৬৪ নিখর্ব্ব, ৯০ বৃন্দ, ১৩ কোটি, ৬৯ লক্ষ, ৩২ হাজার মাইল হয়। কিন্তু এত বড় একটা অঙ্ক, কেবল মুখে বলিতেই জমকাল শোনায়। কিন্তু উহাতে বাস্তবিক জিনিসটা কত দূরে, তাহা বুঝিবার কোনও সহায়তা হয় না। ইহার চাইতে, আমাদের পরিচিত বিষয় দিয়া, সাদাসিদা একটা দৃষ্টান্ত দিলে, হয়তো মনে একটা কোনরূপ ধারণা হইতে পারে। মনে করুন, এখান হইতে সূর্য্য যত দূরে, সেই স্থানটুকুকে আমরা ধরিয়া লইলাম, যেন এক হাত। এখন এই হিসাবে, গ্রহ নক্ষত্রগুলিকে তাহাদের উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া, একবার দেখা যাউক, অবস্থাটা কিরূপ হয়। সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। এতটা স্থানকে আমরা এক হাত ধরিয়াছি। তাহা হইলে সূর্য্যটাকে কত বড় ধরিব? এ অবস্থায়, সূর্য্যের ব্যাস এক ইঞ্চির ষষ্ঠাংশের অধিক হইবে না। অর্থাৎ সূর্য্যটিকে একটি মটরের মত বড় করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহার এক হাত দূরে পৃথিবী; তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির ৬০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এত ছোট জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেও, তাহাকে অণুবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যাইবে না। নেপচুনের স্থান হইবে ৪৯ ফুট দূরে। তাহার ব্যাস এক ইঞ্চির ১৬০ ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ তাহাকে কষ্টে দেখা গেলেও যাইতে পারে। ৪৯ ফুটের ভিতরেই সৌর জগত ফুরাইল। এখন আমাদের নিকটতম তারাটীর স্থান কোথায় করিব? নিকটতম তারাটী এই কল্পিত মটরের মতন সূর্য্যের প্রায় ৮৫ মাইল দূরে হইবে। অর্থাৎ মনে করুন যেন কলিকাতা হইতে চুয়াডাঙ্গা, কিম্বা নারায়ণগঞ্জ হইতে ময়মনসিংহ।

আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। মনে করুন, যেন আমাদের সেই তারায় যাইতে হইবে। যদি সেখানে যাইবার রেল থাকিত, আর সেই রেলের বেগ ঘণ্টায় ৩০ মাইল হইত, তবে আমরা দশ কোটী আট লক্ষ বৎসরের কমে সেখানে পৌঁছাইতে পারিতাম না। ইহা বড় বেশী দিনের কথা হইল। এতদিন যে বাঁচিয়া থাকিব সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ দেখিতেছি। সুতরাং আমাদের আয়ুকালের অনুরূপ একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

অনেকেই আলাদিন এবং আশ্চর্য্য প্রদীপের গল্প পড়িয়াছেন। আলাদিনের একটা প্রদীপ ছিল, সেটাকে ঘষিলেই একটা ভূত আসিত। আলাদিন তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে যেখানে খুসী চলিয়া যাইতেন। এখন যদি হঠাৎ আলাদিনের সেই প্রদীপ কুড়াইয়া তাহার সাহায্যে সেই ভূতটাকে বশ করিয়া একবার আল্‌ফা সেণ্টরীতে যাইতে চেষ্টা করেন, তবে কিরূপ হয় দেখা যাউক। মনে করা যাউক যেন সূর্য্য হইতে নেপচুন পর্য্যন্ত যাইতে সে ভূতটার একদিন মাত্র লাগে। বেগটা সামান্য হইল না। এইরূপ বেগে পৃথিবীর চারিদিক ঘুরিয়া আসিতে এক সেকেণ্ড লাগে না। মনে করুন এই ভূতের ঘাড়ে চড়িয়া, একদিন ভোরে সূর্য্য হইতে ঠিক সোজাসুজি আল্‌ফা সেণ্টরীতে যাইবার জন্য রওনা হইলেন। পৃথিবী যদি আপনার পথে পড়ে, তবে তাহাতে পৌঁছাইতে আপনার আধ ঘণ্টার বেশী দেরী লাগিবে না। আর যে মুহূর্ত্তে পৌঁছাইবেন প্রায় সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে ছাড়িয়া যাইবেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া যাইবে। পরদিন ভোর বেলা আপনি সৌর জগতের সীমা অতিক্রম করিবেন। তৃতীয় দিন শেষ হইবার পূর্ব্বেই বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহেরাও অদৃশ্য হইয়া যাইবে। তারপর বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইবে। আমাদের এই সূর্য্য ক্রমে ছোট হইয়া অবশেষে

একটী তারার আকার প্রাপ্ত হইবে। এবং ২৫ বৎসর পরে আপনি আল্‌ফা সেণ্টরীতে পৌঁছাইবেন।

আজ যদি সেই তারা ব্যোমের মতন ফুটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তথাপি আগামী সাড়ে চারি বৎসরের ভিতরে আমরা তাহার কোন সংবাদ পাইব না। কারণ, তাহার পূর্ব্বে সেই ঘটনার আলোক এখানে পৌঁছাইতে পারিবে না। তারা ফাটিবার সময় না জানি কিরূপ ভয়ানক শব্দ হইবে। সেই শব্দ আমাদের এখানে আসিবার যদি কোন উপায় থাকে, তবে সাত কোটী ত্রিশ লক্ষ বৎসরের পূর্ব্বে আমরা তাহা শুনিতে পাইব না।

এই ত আমাদের নিকটতম তারা! এইরূপে যাহাদের দূরত্ব মাপা গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অধিকাংশ তারাই এত দূরে, যে তাহাদের দূরত্ব মাপিবার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। এই দূরত্বের সহস্রগুণ, লক্ষগুণ দূরেও তারা অবশ্য আছে। ইহা অপেক্ষাও কত বেশী দূরে তারা আছে, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক এত দূরে আসিয়াও আমাদের এরূপ মনে হইবে না, যে আমরা নিতান্ত পরের দেশে আসিয়াছি। এখানেও দেখিব যে আমাদের চিরপরিচিত মাধ্যাকর্ষণ বিধানে কাজ চলিতেছে। এখানেও বিশ্বরাজেরই রাজ্য।

যুগল নক্ষত্র।

আল্‌ফা সেণ্টরী তারাটী যুগল। অর্থাৎ উহাতে বাস্তবিক দুটী তারা আছে। আমাদের পৃথিবী যেমন মাধ্যাকর্ষণবশে সূর্য্যের চারিধারে ঘোরে, সেইরূপ এই দুইটী তারার একটী সেই মাধ্যাকর্ষণবশেই আর একটীর চারিদিকে ঘোরে। এইরূপে একবার ঘুরিয়া আসিতে ৮১ বৎসর সময় লাগে। ইহার পরেই যে তারাটী আমাদের নিকটতম সেটীও যুগল। উহার একটী তারা আর একটীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে ৭৮২ বৎসর সময় লাগে।

যখন একথা মনে করা যায়, যে এই সকল তারার প্রত্যেকটী আমাদের সূর্য্যের ন্যায় এক একটী সূর্য্য, তখন মনে বড়ই বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। আমাদের এক সূর্য্যের এত প্রতাপ, ওখানকার দুই সূর্য্যের তেজ না জানি কিরূপ। সেখানকার গ্রহগণের গতিবিধিই বা কিরূপ। তাহাদের দিন রাতই বা কিরূপ করিয়া হয়।

আবার অনেক স্থলেই দেখা যায় যে যুগল তারার দুটী সূর্য্যের রং দুই রকম। যেমন, একটি হলদে, একটী বেগুনী; একটী হলদে, একটী লাল; একটী সাদা, একটী নীল, ইত্যাদি। এই সকল জগতে বর্ণের বৈচিত্র না জানি কিরূপ। ওখানকার অধিবাসীরা আমাদের এখানে আসিয়া হয়ত নিতান্তই একঘেয়ে মনে করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদিগের একঘেয়ে জগত লইয়া আমাদিগের অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। উহাদের ঝক্‌ঝকে দিন থাকিতে পারে, আলোছায়ার বর্ণ বিচিত্র হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ন্যায় অগণ্য গ্রহনক্ষত্র সজ্জিত এমন সুন্দর প্রশান্ত রাত্রি উহারা অল্পই পায়। সুতরাং ভগবানের এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অনুপম সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব অনুভব করিবার সুযোগ উহাদের কম।

এ পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র যুগলতারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে তিন চারিটা তারা পরস্পরের আকর্ষণে আবদ্ধ থাকিয়া ঘুরিতে দেখা যায়।

নক্ষত্রের বর্ণ-বিভাগ।

তারার বর্ণের কথায় আর একটা কথা উঠিতেছে। বর্ণবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তারার বর্ণের সহিত উহাদের উপাদানের কতকটা সম্বন্ধ আছে। একরূপ বর্ণের তারাতে প্রায় সকল স্থলেই প্রায় একই রকম জিনিসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং এই উপায়ে তারাগুলিকে মোটামুটি কয়েকটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে সাদা তারা। এইরূপ তারার সংখ্যাই অধিক। এ পর্য্যন্ত যত তারা পরীক্ষা করা হইয়াছে তাহাদের প্রায় অর্দ্ধেকই এই শ্রেণীভুক্ত। সর্ব্বোজ্জ্বল নক্ষত্র সিরিয়াস্, এই শ্রেণীর। এই সকল তারার অধিকাংশই, আমাদের সূর্য্য অপেক্ষা অনেক বড়। এবং সূর্য্যের শ্রেণীভুক্ত তারাগুলির অপেক্ষা, সিরিয়াসের শ্রেণীভুক্ত তারাগুলি গড়ে প্রায় পৌণে তিনগুণ দূরে। বাস্তবিক, সিরিয়াস্ আমাদের যেমন কাছে, (৮·৮ আলোক বর্ষ), উহার জাতীয় আর কোন

তারাই এত কাছে নয়। অন্যগুলির অধিকাংশই ইহার প্রায় ৪০ গুণ দূরে। আমাদের সূর্য্য দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা। ইহাদের বর্ণ ঈষৎ হল্‌দে, অথবা নারঙ্গী। আমাদের সূর্য্যে যে সকল জিনিসের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের মধ্যেও মোটামুটি তাহাই পাওয়া যায়। ইহাদের সম্বন্ধে একটী বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, অন্যান্য তারার তুলনায় ইহারা আমাদের অনেক নিকটে অবস্থিত। এমন কি আমাদের নিকটতম আটটি তারার মধ্যে সাতটিই এই জাতীয়। এ সকল বিষয়ের চিন্তা করিলে, অমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণ প্রণালীর মধ্যে যে আগাগোড়া একটা বিশেষ উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং শৃঙ্খলা আছে, একথা মনে না করিয়া থাকা যায় না। তখন আমরা যে খালি এই ক্ষুদ্র সৌর জগতের অধিবাসী, এরূপ উক্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, বিশেষ ভাবে, আমাদের বাসস্থান বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় শ্রেণীর তারাগুলি ঈষৎ লাল রঙ্গের; এবং চতুর্থ শ্রেণীর তারাগুলি ঘোর লাল রঙ্গের। এতদ্ব্যতীত, পঞ্চম একটা শ্রেণীভুক্ত, অনেকগুলি তারা আছে। ইহাদের বর্ণের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই; কিন্তু বর্ণবীক্ষণেতে, ইহাদের বিশেষ লক্ষণগুলি, একরূপ দেখা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তারাগুলিরও সকলেই, ছায়াপথ ভুক্ত। এইরূপে দেখা যায় যে, এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড ঐ ছায়াপথেরই রাজ্য। শূন্যে, এই ছায়াপথ বলয়ের আকারে অবস্থিত আছে। সেই বলয়ের ঠিক মধ্যস্থলের কিঞ্চিৎ উত্তরে, একটি অঙ্গুরীয়ের আকৃতিবিশিষ্ট তারাপুঞ্জের মধ্যে, আমাদের সূর্য্য নিতান্ত দীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। আমাদের নিকটতম তারা আল্‌ফা সেণ্টরি উপরি উক্ত ছায়াপথের কেন্দ্রের খুব নিকটে অবস্থিত। ছায়াপথের দ্বারা আকাশের এক স্থানে আসিয়া, দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিভক্ত স্থানের দুই সীমায় আমরা এখান হইতে দুটি যুগল তারা দেখিতে পাই। উহাদের একটী আল্‌ফা সেণ্টরি, আর একটী ৬১ সিগ্‌নি। ইহারাই আমাদের নিকটতম তারা। এবং ইহাদের উভয়েই আমাদের সূর্য্যের জাতীয় তারা।

ব্রহ্মাণ্ডে সৌর জগতের স্থান।

তারাগুলিকে আমরা নিশ্চলতার দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়া মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক উহাদের কেহই নিশ্চল নহে। আমাদের সূর্য্যের যে একটা গতি বাহির হইয়াছে, তাহা হয়তো সকলেই জনেন। সূর্য্য, বৎসরে প্রায় ১৫ কোটি মাইল হিসাবে, আকাশের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। অন্যান্য তারাগণেরও, এইরূপ এক একটা গতি, প্রত্যেকেরই আছে। যতদূর দেখা গিয়াছে, এই গতির মধ্যে কোন নিয়ম নাই। কাহারও কাহার জন্য অপেক্ষা নাই। দিক্‌বিদিকের কোনরূপ স্থিরতা নাই। যাহার যেদিকে খুসী, সোজা ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহার অর্থ কি? এবং ইহার পরিণামই বা কোথায়? ইহার সম্বন্ধে পরে আরো কিছু বলিবার দরকার হইবে। সম্প্রতি এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে,—হয়ত এইরূপ এক একটা গতি না থাকিলে নক্ষত্রগুলি মাধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে কয়েক লক্ষ বৎসরেই পরস্পরের উপরে আসিয়া পড়িত।

নক্ষত্রের গতি।

অনেক সময়ে, তারার আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এই হ্রাস বৃদ্ধির ভিতরে, সকল স্থলে, কোন শৃঙ্খলা থাকে না; কিন্তু অনেক স্থলে থাকেও। এই শ্রেণীর আল্‌গল্‌ নামক একটী তারা, অনেক দিন হইতে জ্যোতির্ব্বিদদের নিকট পরিচিত। প্রাচীন আরবীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা ইহার কথা জানিতেন, এবং তাঁহারাই ইহার নাম রাখিয়াছিলেন, 'আল্‌ঘোল্‌' অর্থাৎ 'ভূত'। দুই দিন ২০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিটের মধ্যে ইহার হ্রাসবৃদ্ধি হয়। এ বিষয়ে সময়ের এত সুশৃঙ্খলা দেখিয়া, পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে এক একবার করিয়া উহার একটী গ্রহ উহার চারিধারে ঘোরে। তাহাতেই উহার গ্রহণ হইয়া, এইরূপ দেখা যায়। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীমতী বিষ্ণারমনভাই নীলকণ্ঠ বি, এ,

ও

শ্রীমতী সারদসামন্ত মেহ্‌তা বি, এ।

Reg. 169
৫২
৪২৭৭
১৯-১৯০৬.

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

১ম ভাগ। | বৈশাখ, ১৩১৩। | ৯ম সংখ্যা।

স্ত্রীশিক্ষা ও শিক্ষিতা মহিলা।

আজ কাল ভারতের সর্ব্বত্র নবজীবন ও নবোৎসাহের উদ্দীপনা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। নির্ব্বাত নিষ্কম্প মহাসমুদ্রে ঝটিকা উপস্থিত হইলে তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা যেরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপ উপস্থিত করে, সেই রূপ ভারতের এক প্রান্তে গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহার তরঙ্গমালা ভারতের কূলে কূলে আঘাত করিতেছে। কাশীধামের বিগত ভারত-মহিলা পারিষদে নব আশা ও নবোৎসাহের স্ফূরণ বিশেষ অনুভূত হইয়াছে। শিক্ষিতা নারীগণ দেশের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দুর্নীতি দূর করিবার জন্য সংকল্প করিয়াছেন।

ভারতের নারী-সমাজ অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমগ্ন। আমাদের শাসনকর্ত্তারা এতাবৎকাল তাঁহাদের দুঃখ দুর্গতি দেখিয়া ক্ষোভ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা ভিন্ন আর কি করিতে পারেন? আইন করিয়া বিধবাদিগকে চিতানল হইতে রক্ষা করিয়া প্রাণ দান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কি উপায়ে তাঁহাদিগের জীবনভার লঘু করিবেন? বিজাতীয় রাজার সাধ্য কি আমাদিগের পারিবারিক, সামাজিক ব্যাধি সকল নিবারণ করেন। তাঁহারা পুরুষদিগের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন, জ্ঞানস্পৃহায় না হউক, অন্নের প্রত্যাশায় দলে দলে বালকগণ শিক্ষার্থী হইল। যুবাগণ অল্পে অল্পে উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শিক্ষার আলোকে তাঁহাদিগের অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত হইল। তাঁহাদের প্রাণ নৃত্য করিয়া জগতের সভ্য জাতিগণের সহিত উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু হৃদয় এবং চিন্তা ভিন্ন কার্য্যগত জীবন তাঁহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারিল না। দেশাচার, লোকাচার, পারিবারিক বন্ধন তাঁহাদিগের প্রতিকূল হইল। অধিক কি, তাঁহাদিগের জননী পত্নীগণ চরণের কঠিন শৃঙ্খল হইলেন, যুগযুগান্তর ব্যাপী অজ্ঞান অন্ধকারে, ভ্রান্তিময় দেশাচারে তাঁহাদের চক্ষু অন্ধ, যে আলোকে তাঁহাদের প্রাণাধিক পুত্র ও পতির চক্ষের অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে তাহার ক্ষীণতর প্রতিবিম্ব পর্য্যন্ত তাঁহাদের দৃষ্টিকে স্পর্শ করে নাই। পুরুষগণ

তখন বুঝিতে পারিলেন, যে নারীগণকে শিক্ষিতা না করিলে তাঁহাদিগের আর উন্নতির আশা নাই। তাঁহারা নানাবিধ অত্যাচার অপমান সহ্য করিয়া শিক্ষার ক্ষীণ আলোক ধরিয়া পত্নীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে যথাসম্ভব পথ দেখাইয়া কন্যাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষাদান করিতে প্রয়াসী হইলেন। সেই চেষ্টার ফলে আজ কোটী কোটী ভারত রমণীর মধ্যে মুষ্টিমেয় রমণী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত।

ভারতবর্ষে,—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে—প্রথমে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ এদেশীয় লোকদিগের ভিতর পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন, পরে স্বয়ং গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে উদ্যোগী হন। কিন্তু তখনও এদেশবাসী শিক্ষালাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে চায় নাই। গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজ খুলিয়া দেশীয় যুবকদিগকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু ছাত্রগণ অগ্রসর হয় না। শুনিয়াছি, যেদিন বাঙ্গালী যুবা প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন সেই শুভদিনের সম্মানার্থ তোপধ্বনি হইয়াছিল। সেই একদিন আর আজ একদিন!—যেদিন মহামতি বেথুন বঙ্গবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে কন্যাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী বালিকাকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া চরিতার্থ বোধ করিয়াছিলেন—সেই একদিন আর আজ এক দিন! যাহারা শিক্ষা চায় না, শিক্ষার মর্য্যাদা উপলব্ধি করে না, তাহাদিগের জন্য রাশি রাশি উপার্জ্জিত ধন ব্যয় করিবার জন্য যে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়, পাঠিকা ভগিনি, একবার তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা ও নিঃস্বার্থতা চিন্তা করুন। প্রত্যেক ছিদ্র ধরিয়া পদে পদে গবর্ণমেণ্টের দোষ কীর্ত্তন করা আমাদিগের এক কুঅভ্যাস হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? কলিকাতা মহানগরীতে বেথুন কলেজ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট বালিকাদিগের শিক্ষার পথ সুগম এবং সহজ করিয়াছেন—সহরে শত শত সম্পন্ন গৃহস্থ থাকিতে অদ্যাবধি ২০০টী বালিকা এখানে শিক্ষার্থী হইল না। খ্রীষ্টীয় মিশন স্কুলে হিন্দু বালিকারা অধিক যায় না। আজ কাল হিন্দু বালিকাদিগের জন্য মহাকালী [illegible] শালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেই বা আশানুরূপ ছা[illegible]ই? কলিকাতা সহরে শিক্ষার উপযোগী বয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগের মধ্যে শতকরা ৮১ বালক এবং সেই নিয়মে শতকরা ২১ মাত্র বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়া থাকে। কোনমতে বাঙ্গালা ভাষা লেখা এবং পড়া,—তাহাই বা বঙ্গদেশের কয়জন বালিকা জানে? ১৮৮১ সালে যে তালিকা সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহাতে প্রতি ৪২টী বালকের মধ্যে একটী, ও ৮৫৮টী বালিকার মধ্যে একটী মাত্র পাঠশালে যায়। এই বঙ্গদেশই স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সমুদায় ভারতবর্ষের অগ্রণী!! এই ত গেল সামান্য শিক্ষার কথা, উচ্চশিক্ষিতা বঙ্গমাহলার নাম নখাগ্রে গণনা করা যায়। শিক্ষিতা নারীও ভারতের অন্যান্য দেশের তুলনায় বঙ্গে অধিক। কিন্তু বম্বে এবং মান্দ্রাজের শিক্ষিতা মহিলাগণ বঙ্গমহিলাদিগের তুলনায় সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহাদিগের ভিতর কার্য্যকরী শক্তি অধিকতর প্রস্ফুটিত। তাঁহাদের প্রভাব সমাজমধ্যে, দেশমধ্যে অনুভূত হইতেছে। কিন্তু শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার ভাব সেইরূপ নহে।

ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষার সুফল অস্বীকার করি না। কিন্তু বাহ্যিক উপায়ে ফলাফলের বিচার করিতে হইলে (১) প্রথমে দেখিতে হইবে, শিক্ষিতা মহিলারা কি কি প্রকাশ্য কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। (২) তাঁহারা কি কি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত সংবাদপত্র কয়খানি আছে। (৩) তাঁহাদিগের দ্বারা কোন প্রকার জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে কি না?

বীজ বপন করিয়াই তৎপরদিন কেহ ফলে ফুলে সুশোভিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিতে আশা করে না। কিন্তু যথাসময় উপস্থিত হইলে ফলভোগের সময় আসে। বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার বীজ যাঁহারা প্রথম রোপণ করিয়াছিলেন তাঁহারা কি এখনও তাহার সুফল দেখিবার আশা করিতে পারেন না? ৫০ বৎসরের মধ্যে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রতাপশালী বুয়র জাতির অভ্যুদয় হইল; ৩০।৩৫ বৎসরের চেষ্টায় জাপান সমুদায় জগৎকে

স্তম্ভিত, চকিত, পুলকিত করিতে সমর্থ হইল; আর এতদিন পরে আজিও কি শিক্ষিতা বঙ্গনারী স্বদেশবাসীর সম্মুখে তাঁহাদিগের উচ্চ শিক্ষার সুফল দেখাইতে সক্ষম হইবেন না? তাঁহাদিগের মধ্যে এম, এ, বি, এ, উপাধি-ধারিণী আছেন, ডাক্তার আছেন, সংগীত-বিদ্যায় চিত্র-বিদ্যায় পারদর্শিনী আছেন,—যাঁহারা শিক্ষায় এবং বিদ্যাবত্তায় ইউরোপীয় সুশিক্ষিতা মহিলাদিগের পার্শ্বে উপবেশন করিবার উপযুক্ত। কিন্তু সামাজিকভাবে ফলের প্রত্যাশা করিলে নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষকতা, কেহ বা চিকিৎসাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। যে কয়টী বালিকা বিদ্যালয় দেশে আছে তাহারও উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী নাই। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী অন্বেষণ করিলে মিলে না। পুস্তক প্রচার এবং পত্রিকা-সম্পাদন কার্য্য শিক্ষিতা মহিলার হস্তে অতি সামান্যভাবে নিযুক্ত আছে, বা প্রায় নাই বলিলেও চলে। সাহিত্যক্ষেত্রে কোন কোন স্ত্রী-কবি প্রতিভা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী। দুই তিন খানি সংবাদ-পত্র শিক্ষিতা মহিলা দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে বটে, তন্মধ্যে একজন মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী। অদ্যাবধি জনহিতকর কোন স্থায়ী কার্য্য বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ভারতের অন্যান্য দেশীয় শিক্ষিতা রমণীগণ সম্বন্ধে যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে সমর্থ না হইলেও সুদূর হইতে আমরা তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করিতেছি। তাঁহারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্পসংখ্যক হইলেও তাঁহারা নিশ্চেষ্ট নহেন। তাঁহাদের ভিতর ডাক্তার আছেন, বারিষ্টার আছেন, শিল্পী আছেন, লেখিকা আছেন, সংবাদ-পত্র সম্পাদিকা আছেন। জনহিতকর কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত দেখিবার বাসনায়ও আমাদিগকে একেবারে নিরাশ হইতে হইবে না। রমাবাইএর "সারদা সদন" দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদিও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিণী নহেন তত্রাচ সুশিক্ষিতা।

ভারতব্যাপী এই জাতীয় উদ্দীপনার দিনেও কি শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা নিশ্চেষ্ট, নীরব থাকিবেন? বিগত ৫০ বৎসরে আমেরিকা ও ইংলণ্ডের উচ্চ শিক্ষিতা রমণী-গণ কি অপূর্ব্ব ব্যাপার দেখাইয়াছেন। কবির কল্পনা যে উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিতে পরাস্ত হইত তাহা আজ প্রত্যক্ষ ব্যাপার হইয়াছে। শিক্ষার এমন বিভাগ নাই, এমন দুরূহ বিষয় নাই, যাহা নারী-বুদ্ধিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে।—বিদ্যামন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে না করিতে নারী শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিলেন,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-রমণীও সে সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। সে দেশে কর্ম্মক্ষেত্রে নারীর কি ভ্রূভঙ্গ? সেখানেও নারী পুরুষের হস্তের কার্য্য তুলিয়া লইয়াছেন। কার্য্যকুশলতায় নারী পুরুষকে পরাস্ত করিতেছেন। গ্রন্থ রচনায় রমণীর কৃতিত্ব অল্প নহে। এমন বিষয় নাই, যে বিষয়ে তাঁহারা পুস্তক রচনা করেন নাই। পত্রিকা-সম্পাদন কার্য্যে তাঁহারা বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। জনহিতকর কার্য্যে তাঁহাদিগের উৎসাহ উদ্যমের তুলনা নাই। দেশের কত যে কল্যাণ তাঁহারা করিতেছেন, তাহার গণনা হয় না। নারীশক্তি অপরাজিতা। ইংলণ্ডের লোক সহজে উচ্চশিক্ষার দ্বার নারীদিগকে উদ্ঘাটন করিয়া দেয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতা রমণীগণের কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা অনুশোচনা করিবার পথ পান না। বরং নারী চরিত্রের প্রভাব দেখিয়া শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে পূর্ণ হইতেছেন। এমন কোন্ কঠিন কার্য্য আছে, যাহা নারীর অসাধ্য? দৈহিক বল একমাত্র বল নহে; হৃদয়ের বলে যাহা হয় দৈহিক বলে তাহা অসাধ্য। স্বাধীনতার লীলাভূমি, ধনরত্নে পরিপূর্ণ, জ্ঞানালোকে দীপ্যমান সেই সকল দেশে যদি স্ত্রীশিক্ষার এত প্রয়োজনীয়তা থাকে, সে দেশের রমণীগণ স্বামীসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, দলে দলে দেশের সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারেন, তবে ভারত-রমণী একবার নিজের অবস্থা স্মরণ করুন—যে দেশে গৃহে গৃহে বিধবাগণ দাসীর ন্যায় শ্রম করিয়াও অনাদৃতা হইয়া নীরবে মর্ম্মে মর্ম্মে রোদন করিতেছে—একাহারে যাহার ভোগের পরাকাষ্ঠা,—তাহার জন্যও যাহাকে পর-

মুখাপেক্ষী হইয়া জীবন ধারণ করিতে হইতেছে,—সে দেশেও কি শিক্ষিতা রমণীর কিছু করিবার নাই? কার্য্যক্ষেত্রের প্রশস্ততার তুলনায় মুষ্টিমেয় রমণীর চেষ্টা, অঞ্জলি করিয়া সাগর বারি সেচনের চেষ্টার ন্যায়। কিন্তু বিধাতা যখন দ্বারে আঘাত করিয়াছেন, তখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। সাধু দৃষ্টান্তের ফল বিফলে যায় না। ভারত-সন্তানের জাতীয় জীবনে অতি শুভযোগ উপস্থিত। এই শুভক্ষণে ভারত রমণীর কার্য্যারম্ভের সময়। সিদ্ধিদাতা বিধাতার হস্তে কার্য্যের জন্য আমরা দায়ী।*

শ্রীহেমলতা সরকার।

ব্রহ্মাণ্ড।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নূতন তারা।

মাঝে মাঝে এক একটী নূতন তারাও আকাশে দেখা যায়। খৃষ্টের জন্মের ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে, এইরূপ একটি তারা দেখা গিয়াছিল। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে এরূপ আর একটী দেখা যায়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে, এইরূপ আর দুটি তারা দেখা গিয়াছিল।

হঠাৎ একটা তারা জ্বলিয়া উঠিবার কি কারণ হইতে পারে? পণ্ডিতেরা এ প্রশ্নের নানারূপ উত্তর দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটি উত্তর এই যে, বিপরীতগামী দুইটী জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষণ হইয়া যে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই নূতন তারার সৃষ্টি। ১৯০১ সালের নূতন তারার সম্বন্ধে, বর্ণবীক্ষণ দিয়া যে সব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে দুইটী বিপরীতগামী জ্যোতিষ্কের মতই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, একটী নীহারিকার ভিতর দিয়া, একটী তারা চলিয়া যাওয়াতে ঐরূপ কাণ্ড হইয়াছিল।

নীহারিকা-বাদ।

নীহারিকার কথা পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। আকাশে এই সকল জ্বলন্ত বাষ্পময় পদার্থ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি একেবারেই বাষ্পময়। কোন কোনটীর স্থান বিশেষ ঘনীভূত;—যেন ঐ সকল স্থান জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ণবীক্ষণেতেও এইরূপ জমাট বাঁধিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের আকৃতি অতিশয় বিচিত্র। বাদামী আকারের এবং কুণ্ডলী পাকান নীহারিকার সংখ্যা খুব অধিক। ইহাতে বোধ হয় যে, এই আকারের দিকে উহাদের একটা ঝোঁক আছে।

এই সকল নীহারিকা কালে এক একটী জগতে পরিণত হইবে, পণ্ডিতেরা এইরূপ বিশ্বাস করেন। ইহাদের অধিকাংশের আকৃতি দেখিলে মনে হয়, যেন ইতিপূর্ব্বেই উহাদের মধ্যে ঘূর্ণন আরম্ভ হইয়াছে। একটী নীহারিকাকে ধরিয়া পাক দিলে যে উহার বাদামী অথবা কুণ্ডলীর মত আকৃতি হইতে পারে, একথা বিশ্বাসযোগ্য। ইহার উপরে যখন দেখা যায় যে, কোন কোন নীহারিকার, যুগল তারার ন্যায়, দুইটী অংশ আছে, এবং তাহার একটী ইতিমধ্যেই আর একটীকে প্রদক্ষিণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন স্বভাবতই মনে হয় যে, কালে উহারা ঘন হইয়া যুগল তারায় পরিণত হইবে। হয়ত এইরূপেই, নীহারিকা হইতে তারাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রথমে বাষ্পরাশি মাত্র ছিল, ক্রমে, বাষ্পের অণু সকলের স্বাভাবিক আকর্ষণবশতঃ উহার স্থানে স্থানে ঘন হইতে আরম্ভ করিল। এরূপ অবস্থায়, ঐ ঘনীভূত

---

* গবর্ণমেণ্ট-প্রকাশিত তালিকা অনুসারে (১৮৮৭—৯৭ পর্য্যন্ত) দশ বৎসরে বাঙ্গালা, বোম্বাই, এবং মান্দ্রাজে নিম্নলিখিত হারে স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে :—

	১৮৮৭		১৮৯৭
বাঙ্গালা	৮৮,৭৩১ (বিদ্যালয়ের ছাত্রী)	১,	৫৯১৯ (ঐ)
বম্বে	৫২,৯৪১	,,	৮২,১৬৩ (ঐ)
মান্দ্রাজ	৬৫,১৩৭	,,	১,১৬,৭৪৭ (ঐ)

অর্থাৎ বঙ্গদেশে এই দশ বৎসরে শত করা ১.৬১ হইতে ১.৯৩ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, বম্বে শতকরা ৩.১ হইতে ৪.৩ এই হারে ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার স্রোত মন্দ গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। অচিরকালের মধ্যে মান্দ্রাজ এবং বম্বে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্গদেশকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে

স্থানকে কেন্দ্র করিয়া, নীহারিকাটীর ঘুরিতে আরম্ভ করাই স্বাভাবিক নিয়ম। নীহারিকা যতই ঘন হইতে আরম্ভ করিল, ততই ঘূর্ণনের বেগ বাড়িয়া চলিল। এবং ততই নীহারিকার বাহিরের অংশগুলির পক্ষে, তাহার সহিত সংশ্রব রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

অণুর প্রতি অণুর আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। সেইরূপ, কোন বস্তু যখন একটা কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, তখন সেই কেন্দ্র হইতে দূরে চলিয়া যাইবার জন্য, তাহার একটা বেগ উৎপন্ন হওয়াও স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া নীহারিকার বাহিরের অংশগুলি ক্রমে তাহা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। কিন্তু পৃথক হইয়াও তাহারা অধিক দূরে চলিয়া যাইতে পারে না। তাহাকে, আকর্ষণের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, মূল নীহারিকাকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এইরূপেই, বোধ হয়, সূর্য্যের ভিতর হইতে আমাদের গ্রহগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল। সূর্য্যও এক সময়ে নীহারিকা ছিল। এখন সে নীহারিকার অবস্থা অতিক্রম করিয়া গ্রহ-উপগ্রহ-পরিবেষ্টিত আমাদের সূর্য্যরূপে শোভা পাইতেছে।

অনন্ত আকাশে যত তারা মিট্ মিট্ করে, তাহারা সকলেই সূর্য্য। সকলেই, এইরূপে, নীহারিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আর, এখন বড় হইয়া সূর্য্যের পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের সূর্য্যের ন্যায়, নিশ্চয়ই তাহাদেরও, অনেকের গ্রহ উপগ্রহরূপ পুত্র-পৌত্রাদি আছে। তথায় অগণ্য জীব সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। হয়ত তাহাদের অনেকে, জ্ঞানধর্ম্মে আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক মধুরতর ভাবে দয়াময়ের জয় কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

নীহারিকা হইতে যেরূপে সূর্য্য ও গ্রহাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইল, ইহাই আধুনিক নীহারিকা-বাদ। এই নীহারিকা-বাদ ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে নাকি গুপ্ত ভাবে ছিল। শাস্ত্রের সেই সকল অংশের, আধুনিক বিজ্ঞানের অনুযায়ী ব্যাখ্যা, আজকাল শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল ব্যাখ্যা যদি, বাস্তবিকই, শাস্ত্রার্থের যথার্থ ব্যাখ্যা হয়, তবে তাহা নিতান্তই আনন্দের বিষয় মনে করিতে হইবে। এই ভারতবর্ষে, প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছিল। কল্পনার আবরণে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানের জ্যোতি, এখন কতই না ম্লান হইয়া গিয়াছে? অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের স্থলেও, এইরূপে কল্পনার চাপায় পড়িয়া, সত্যের জীবন হারান আশ্চর্য্য কি? এখন যদি সেই কল্পনার আবর্জ্জনা হইতে সত্যকে পুনরায় উদ্ধার করিয়া, দেশে তাহার প্রতিষ্ঠার সম্ভব হয়, তবে তাহাও ভগবানের বিশেষ কৃপা।

জগতের পরিণাম।

আমরা জ্যোতিষ্কগণের জন্ম দেখিলাম। এখন উহাদের জীবনের সম্বন্ধে আর কিরূপ সংবাদ সংগ্রহ করা যায়? উহারা কি চিরজীবী? না, উহাদের মৃত্যু অথবা ধ্বংস আছে?

জড় জগতের কোন অবস্থারই নিত্যতা নাই। যাহার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার বিনাশও হইবে। এই সকল গ্রহনক্ষত্রাদির কেহই চিরকালের জন্য আসে নাই। যে নিয়মে নীহারিকা জমাট বাঁধিয়া সূর্য্য হইয়াছে, সেই নিয়মেই, সূর্য্য ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া, তাহার আগুন নিভাইয়া ফেলিবে। তখন এই অনন্ত আকাশে, চির অন্ধকারের ভিতরে, সে তাহার জীবন ও আলোকবিহীন ক্ষুদ্র পরিবার লইয়া, আপনার একঘেয়ে কাজ করিতে থাকিবে।

কিন্তু ইহাই কি শেষ? ইহাই যদি শেষ হইত, তথাপি আমাদের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। এরূপ ঘটনা ঘটিতে এখনও অনেক লক্ষ বৎসর বিলম্ব আছে। তত দিনে, এই মনুষ্যজাতির নাম পর্য্যন্ত, হয়ত পৃথিবীতে থাকিবে না। আমাদের নিজের সম্বন্ধে ত কথাই নাই। এক সূর্য্য গেল, আর এক সূর্য্য আসিল, ব্রহ্মাণ্ডের জমা-খরচের আয় ব্যয় ঠিকই রহিয়া গেল। যত দিনে আমাদের সূর্য্য নিভিয়া যাইবে, তত দিনে ঐ নীহারিকাগুলি আবার সূর্য্যের পদ লাভ করিবে। আবার, নূতন জীব লইয়া নূতন জগতের সৃষ্টি হইবে।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। যাহার শুধু ব্যয় আছে, কিন্তু আয় নাই, সে ভয়ানক ধনশালী এবং অতিশয় কৃপণ হইলেও, তাহার ধন একদিন শেষ হইয়া যাইবেই। সুতরাং সহজেই প্রশ্ন উঠে যে, বর্ত্তমান নীহারিকাগুলি শেষ হইয়া গেলে, এই ব্রহ্মাণ্ডের দশা কি হইবে? তখন ত আর নূতন সূর্য্য উৎপন্ন হইবার উপায় থাকিবে না। সুতরাং নূতন নীহারিকার সৃষ্টির উপায় দেখিতে না পারিলে, এ ব্রহ্মাণ্ডের আলো একদিন নিবিয়া যাওয়া অনিবার্য্য। ইহাই কি তবে ব্রহ্মাণ্ডের পরিণাম? ইহাতে পুনরায় নূতন আলো এবং নূতন জীবনের স্রোত প্রবাহিত হইবার কি কোনও হেতু বর্ত্তমান নাই?

নূতন সৃষ্টির উপায়।

আছে।—দেখা যাউক সেই হেতু কিরূপ! আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলির কিরূপ অসাধারণ বেগ, তাহা সকলেই জানেন। যদি কোনও কারণে এই বেগ হঠাৎ থামিয়া যায় তবে তাহা তাপে পরিণত হইবে। সেই তাপ এত অধিক হইবে যে, তাহাতেই সেই জ্যোতিষ্ক গলিয়া বাষ্পময় নীহারিকা হইয়া যাইতে পারে। দুইটী জ্যোতিষ্কের সংঘর্ষণ হইলে, ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে, এবং তাহাতে উভয় জ্যোতিষ্কই, নীহারিকায় পরিণত হইবে।

এইরূপ সংঘর্ষণ হওয়ার দুইটী উপায়ের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমাদের এই যে সৌর জগত, ইহার গ্রহগুলির গতি থামিয়া যাইবার আপাততঃ কোনও কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ইহাদের পথে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও বাধা (resistance) থাকিলে, কালে ইহাদের গতি শ্লথ হইয়া ইহাদের সূর্য্যে গিয়া পড়া অসম্ভব নয়। ইহার দরুণ যে তাপের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে সৌরজগতের অধিকাংশ বাষ্পময় হইয়া যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, তারাগুলির প্রত্যেকেরই, এক একটা অতিশয় দ্রুত গতি আছে। এই গতির শেষ ফলস্বরূপ কালে তারার সংঘর্ষণ হওয়ার কথা কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ সংঘর্ষণ দুই এক লক্ষ বৎসরের ভিতরে হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা দেখা যায় না। ততদিন এই সৌরজগতের অগ্নি জ্বলিবে কি না কে বলিতে পারে? হয়ত ভগবানের এরূপই ইচ্ছা যে, আমাদের সূর্য্য নিভিয়া গেলে পর ঐরূপ সংঘর্ষণের দ্বারা তাহার অগ্নি পুনরায় জ্বলিবে।

সংঘর্ষণ ভিন্নও যে নূতন জগতের সৃষ্টি না হইতে পারে, এরূপ নহে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত "হেল্‌মজ্" হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, আকাশে যে অতিশয় সূক্ষ্ম ধূলিকণা (cosmic dust) বিস্তীর্ণ রহিয়াছে তাহা ঘনীভূত হইলে এত তাপ উৎপন্ন হইবে যে, তাহা হইতে নূতন জগতের সৃষ্টি হইতে পারে।

যেরূপ করিয়াই হউক, সৃষ্টির প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভগবান নিশ্চয়ই উপায় রাখিয়াছেন। ফ্লামারিয়ঁ বলেন যে, "তাহা যদি না হইত, সূর্য্যগণ একবার নিবিলে যদি পুনরায় জ্বালাইবার ব্যবস্থা না থাকিত,—তবে এত দিনে, আমরা আকাশে একটিও তারা দেখিতে পাইতাম না। কারণ, সৃষ্টি এতই প্রাচীন যে, তাহাকে আমরা অসীম অতীত কালের বিষয় মনে করিতে পারি। সৃষ্টির আরম্ভ অবধি এ পর্য্যন্ত, অসংখ্য সূর্য্য জ্বলিবার এবং নিবিবার অবসর পাইয়াছে। অনন্ত কালের দিক দিয়া দেখিলে, বর্ত্তমান সূর্য্যগুলিকে, নিতান্তই নূতন বলিয়া বোধ হয়। পুরাতন সূর্য্য যতই লোপ পাইয়াছে, ততই নূতন সূর্য্য তাহাদিগের স্থান অধিকার করিয়াছে। সৃষ্টিপ্রবাহ এমনি চলিয়াছে এবং চলিবে।

যাহা হউক, সৃষ্টির আদি অন্ত আমাদের এতই নিকটবর্ত্তী নহে যে তজ্জন্য আমাদের উদ্বিগ্ন না হইলে চলে না। সুতরাং ইহা অপেক্ষা আমাদের অধিকতর নিকটবর্ত্তী একটা বিষয়ের কথা বলিতেছি। তারাগুলির কোনটার সহিত আমাদের সূর্য্যের সংঘর্ষণ হওয়া, অল্প দিনের ভিতরে সম্ভব নহে, একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প দিনের ভিতরে এমন কোন দুর্ঘনা হওয়া সম্ভব কি না, যাহাতে এই পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে? সম্প্রতি শ্রীযুক্ত জে, ই, গোর সাহেব, এ বিষয়ে 'নলেজ' পত্রিকায়, একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে,

আশু প্রলয় সম্ভব কি না?

নক্ষত্রমণ্ডলীকে দেখিয়া, আপাততঃ তাহাদের কাহারও সহিত সূর্য্যের সংঘর্ষণ হওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা হয় না বটে,—কিন্তু, নক্ষত্র ভিন্ন অন্য কোনরূপ জিনিষের সহিত যে শীঘ্র তাহার কোনরূপ সংঘর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, একথা তেমন নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সূর্য্য অতিশয় বেগের সহিত আকাশের ভেগা নামক নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার পথে কোনরূপ তারা যে উপস্থিত নাই, একথা দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলেই বোঝা যায়। কিন্তু তারা না থাকিলেও জ্যোতির্ব্বিহীন একটা অদৃশ্য পদার্থ যে না থাকিতে পারে, এমন কথা বলা যায় না। আকাশে নিশ্চয়ই এমন জিনিষ অনেক আছে যে তাহারা এককালে সূর্য্য ছিল, এখন নিভিয়া গিয়া, আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াছে। এরূপ একটা জিনিষ যদি সূর্য্যের পথে থাকে, তবে তাহার বিষয় আমাদের না জানিবারই কথা। সুতরাং এইরূপ আলোকবিহীন একটা পদার্থের সহিত সূর্য্যের সংঘর্ষণ হওয়া তেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এরূপ সংঘর্ষণের দ্বারা যে তাপের উৎপত্তি হইবে, তাহাতে অল্প সময়ের ভিতরে পৃথিবীর ধ্বংস হইয়া যাওয়াও আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এরূপ একটা ঘটনা আমাদের অজ্ঞাতসারে, হঠাৎ ঘটিয়া যাইবার কোন সম্ভবনা নাই। আগন্তুক জিনিষটার নিজের আলোক না থাকিলেও সূর্য্যের আলোক তাহার উপরে পড়িবেই। সে জিনিষটা যদি আমাদের সূর্য্যের ½ বড় হয়, তবুও তাহা খুবই প্রকাণ্ড হইবে। এমত অবস্থায়, সৌরজগতের সীমার অনেক দূরে থাকিতেই তাহাকে তারার ন্যায় দেখা যাইবার পরেও সূর্য্যের কাছে পৌঁছাইতে উহার প্রায় ১৫ বৎসর লাগিবে। ইহার অনেক পূর্ব্বেই আমরা তাহার চরিত্র এবং উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব। সংঘর্ষণের সময় উহার বেগ সেকেণ্ডে ৪ শত মাইলেরও অধিক হইবে। এরূপ সংঘর্ষণের ফল যে কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আগন্তুক এবং সূর্য্য উভয়েই এক ঘণ্টার ভিতরে বাষ্পে পরিণত হইয়া যাইবে; এবং তাপ এত উৎপন্ন হইবে যে, তাহাতে কেবল পৃথিবী নহে, সৌরজগতের অধিকাংশ গ্রহই বিনাশ পাইবে।

যাহা হউক, এতদিন যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই, তখন আমরা আশা করিতে পারি যে আরও অনেক দিন আমরা নিরাপদে কাটাইতে পারিব।

উপসংহার।

আমরা নিতান্ত বড় বড় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু, ভগবানের কাছে ছোট বড় সকলেই সমান। বড়র প্রতি তাঁহার যে আদেশ,ছোটর প্রতিও তাঁহার সেই আদেশ। এই বিশ্বের ভিতরে, তিনি ছোট বড় বিচার না করিয়া, একই নিয়মে, সকলকে শাসন করিতেছেন। সূর্য্যের চারিদিকে গ্রহগণ ঘোরে; গ্রহের চারিদিকে উপগ্রহ ঘোরে। সেইরূপ আবার, পরমাণুর চারিদিকে পরমাণু ঘোরে। পরমাণু (atom) পরমাণু মিলিয়া অণুর (molecule) উৎপত্তি হয়। এই অণুর ভিতরে পরমাণুগুলির পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ? অধ্যাপক ডারউইন বলিয়াছেন যে, সৌরজগতের ভিতরে সূর্য্য এবং গ্রহাদির যেরূপ সম্বন্ধ, এ সম্বন্ধও সেইরূপ। সমস্ত বিশ্বের এক আইন, এক রাজা, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আমার কথা ফুরাইয়াছে। উপসংহার কালে একটা কথা স্মরণ করি। ইতিমধ্যেই নাকি কোন কোন দিকে পরিদৃশ্যমান জগতের শেষ দেখা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ বলেন যে, ওদিককার আকাশ তেমন স্বচ্ছ নহে বলিয়া, ওদিকে আর তারা দেখা যায় না। এই পৃথিবীটা যত স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহার মধ্যে যদি একটী কমলালেবুর মতন বড় জিনিষের অণুগুলি ছড়ান থাকে, তাহা হইলেই, আকাশ এত অস্বচ্ছ হইয়া যাইতে পারে যে, দূরবর্ত্তী তারাগুলি তাহার ভিতর দিয়া আর দেখা যাইবে না। কেহ বলেন যে, যে ঈথার আলোকের তরঙ্গ বহিয়া আনে, তাহা আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাহিরে আর নাই। সুতরাং অন্যান্য জগতের আলো এখানে আসিতে পারে না। অথবা অন্যান্য জগৎগুলি এতই দূরে, যে সেখানকার ব্যাপার আমাদের

যন্ত্রাদির ক্ষমতার বহির্ভূত। যে কারণেই হউক আমাদের ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত নহে। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি লইয়া, অনন্ত সৃষ্টির সমুদায় দেখিতে পাইব, আমাদের এরূপ আশা করাই ধৃষ্টতা। সুতরাং এতগুলি বড় বড় কথা বলিয়া আমরা অনন্ত সৃষ্টির কি পরিমাণ ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি? কিছুই নহে! কিছুই নহে!

এই অনন্তের মধ্যে আমরা কে, যে ভগবান্ আমাদের সংবাদ লইবেন? দাবির হিসাবে, এ প্রশ্নের উত্তরে, আমাদের কিছুই বলিবার নাই। এই পরমাণুগুলি আমাদের তুলনায় যেরূপ ক্ষুদ্র, সৃষ্টির তুলনায়, আমরা তদপেক্ষাও অসংখ্যগুণে অকিঞ্চিৎকর। ইহার মধ্যে আমাদের যতটুকু দাবি করিবার যোগ্যতা আছে, তদপেক্ষা অনেক বেশী, আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই পাইতেছি। কিন্তু তবুও যে আমাদের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। আমরা বলি

"যো বৈ ভূমা, তৎসুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।"

"যিনি ভূমা, যিনি মহান্ তিনি সুখস্বরূপ; ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই।"

আমরা স্বয়ং ভগবানকে ছাড়িয়া আর কিছুতেই তৃপ্ত হইব না। আর একথা সকলে বিশ্বাস করুন, ভগবান কখনই আমাদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখিবেন না। সৃষ্টির তত্ত্ব আমাদিগকে এবিষয়ে আশ্বাস প্রদান করিতেছে। তাঁহার অনন্ত শক্তির নিকট ব্রহ্মাণ্ডই বা কত বড়, পরমাণুই বা কত ছোট! তিনি সকলের ভিতরেই শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। সকলেরই সংবাদ সমান ভাবে লইতেছেন। পরমাণুর কার্য্যকলাপ দেখুন। তাহাতেও দেখিবেন, ভগবান স্বয়ং তাহার কাজ বাঁটিয়া দিয়াছেন। এবং উহার সংবাদ তিনি এমন ভাবে লইতেছেন, যেন উহাই তাঁহার একমাত্র কাজ। এমন ক্ষুদ্র বস্তু এবং তাহার অতি সামান্য ব্যাপারকেও তিনি এক মুহূর্ত্ত ভুলিয়া থাকেন না। তাহার কোন চেষ্টাকে ব্যর্থ হইতে না দিয়া, এই মহান্ বিশ্বের সৃষ্টিতে নিয়োগ পূর্ব্বক তাহা সার্থক করেন। আর আমাদের ভিতরে মন বুদ্ধি এবং আত্মার সঞ্চার করিয়া দিয়া,—আমাদের প্রাণে মহতী আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করিয়া দিয়া তিনি এ সমুদয়কে চরিতার্থ করিবেন না, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা?

সমাপ্ত।

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি ট্রেণে একাকীই চলিলাম। সারাঘাটে পদ্মা পার হইবার সময় সেই সরকার আসিয়া আমায় সঙ্গে করিয়া লইয়া জাহাজে গেল, ও পুনরায় পার হইলে আমায় নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে আনিয়া রাখিয়া গেল। সারা-রাত অনিদ্রভাবে কাটাইলাম। অতি প্রত্যূষে ট্রেণ শিলিগুড়িতে আসিল; আমি বাতায়নের সম্মুখে তৃষিত নয়নে চাহিয়া বসিয়াছিলাম। ষ্টেসনে কাহাকেও দেখিলাম না, সরকার আসিয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া আহারাদি আনিয়া দিল ও একখানি টেলিগ্রাম দিল। খুলিয়া দেখিলাম তাহা সুরেশের প্রেরিত ও তাহার মর্ম্ম এই,—"এখনো শয্যাগত, কোন ভয় নাই, দার্জ্জিলিংএ দেখা হবে।"

শিলিগুড়ি হইতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমার মন বড়ই অবসন্ন হইয়া পড়িল, যাঁহার সহিত বিবাহ হবে, যাঁহার হাতে আমার এই জীবন সমর্পণ করিতে যাইতেছি, এখনো ত তাঁহাকে চক্ষে দেখিলাম না। কে জানে আমি কিসের মোহে মুগ্ধ হইয়া চলিয়াছি, এই মোহস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়া কি শুধু চক্ষে মায়ামরিচীকার দৃশ্য দেখিব? আমার চিন্তাতন্ত্রী ছিন্ন হইয়া গেল, সেই উন্নত শৈলশিখরে উঠিয়া ট্রেণ সর্পগতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া ছুটিতেছে। সে অদ্ভুত দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা হয় না। ট্রেণের এক পার্শ্বে নিবিড় বিজন বনশ্রেণী, অন্য পার্শ্বে হয়ত গভীর খাদ। এত ধারে ট্রেণ চলিতেছে, মনে হয় এখনি বা ভাঙ্গিয়া পড়িল। ট্রেণ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে

উঠিতে লাগিল, ইংরাজেরা ইহাকে খেলার ট্রেণ (Toy train) বলে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে। দূরে দূরে চা বাগানগুলি শোভা পাইতেছে, নিকটে কুলিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসগৃহ ও একটি সুন্দর বাঙ্গলা বাড়ী দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতগাত্র নানাবিধ ফার্ণে শোভিত। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের গাত্র দিয়া রজতসলিলা সুন্দর নির্ঝরিণী বহিয়া আসিতেছে। 'পাগলা ঝরা' নামক নির্ঝরিণীর বর্ণনা ভাষায় হয় না। যেন কে তরল রৌপ্য-রাশির স্রোত ঢালিয়া দিয়াছে, আর খল খল হাসিয়া তাহা পর্ব্বতগাত্র দিয়া অবিরাম ধারায় ঝরিতেছে। এই লুকাইয়া গেল, আর দেখা যায় না, আবার অন্য প্রান্তে সেই হাস্যময়ী মূর্ত্তি রূপোচ্ছ্বাস ছড়াইয়া বহিয়া যাইতেছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে পাহাড়ী বালকবালিকা পাতায় করিয়া চেরিফল, ফার্ণ, অর্কিডের ফুল, লিলি ইত্যাদি লইয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেছে ও "মেম সাহেব সেলাম" বলিয়া হাত বাড়াইয়া সেই ফুল বা ফল ধরিতেছে। ট্রেণ ছাড়িয়া দিলেও ট্রেণের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে কিয়ৎদূর যাইতেছে। অতি দূরে নিম্নে উপত্যকা দেখা যাইতেছে। কি স্নিগ্ধ শীতল বায়ু, তাহাতে যেন শরীরে নবশক্তি সঞ্চারিত হইয়া উঠে। এই প্রকারে করসিয়ঙ্গ্ পার হইলাম। আমি উদ্বেলিত হৃদয়ে, তৃষিত নয়নে চাহিয়া বসিয়া আছি, আমার ভাবনা চিন্তা এসব সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াও ভুলিতে পারিতেছি না। এত সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্য, কিন্তু আমি যেন তাহার কিছুই উপভোগ করিতে পারিতেছি না। কতক্ষণে দেখিব, তবে আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হইবে। ট্রেণ ক্রমে গুম্ ষ্টেসনে আসিল। এই স্থানটি সর্ব্বোচ্চ, স্থানটিকে যেন মেঘমালায় ঘিরিয়া রাখিয়াছে, বায়ু অতি শীতল। ট্রেণ মন্দগতিতে ছাড়িয়া দিল, দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। দূর হইতে দার্জ্জিলিংএর সৌধমালা দেখা যাইতে লাগিল। ট্রেণ ক্রমশঃ কত বাড়ীর পাশ দিয়া চলিল, দুইবার হুইসল্ দিয়া মৃদু মন্দ গতিতে ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

আমি সঙ্কুচিতভাবে সেই প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলাম। সরকার জানিত আমি কোন প্রকোষ্ঠে আছি, এখনি তাঁহাকে লইয়া আসিবে। কই, কেহ ত আসে না, আমার বক্ষের দ্রুত কম্পন যেন বাহিরে অনুভব করিতে লাগিলাম। ষ্টেশন লোকের ভিড়ে, কুলিদের চীৎকারে পূর্ণ হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সরকার এক নেপালী চাকর সঙ্গে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই চাকর আমার হাতে একখানি পত্র দিয়া সেলাম করিল, আমি পত্র দেখিয়া অবাক্, তখন ভাবিবার অবসর নাই, তাড়াতাড়ি খুলিয়া পড়িলাম :—

"প্রিয় ভগিনী—

আমি আজ এখানকার ফ্যান্সি ফেয়ারে যাইতেছি, সেজন্য আমি নিজে তোমায় আনিতে ষ্টেসনে যাইতে পারি নাই। মিঃ বসুও কাজে অন্যত্র গিয়াছেন। আমার ছেলে ললিত ও বেহারাকে পাঠাইলাম। তোমার জন্য রিক্স পাঠাইয়াছি, নির্ব্বিঘ্নে আসিবে। বাড়ীতে সকল দ্রব্যই ঠিক পাইবে।

শুভানুধ্যায়িনী লীলা বসু।

পুঃ সুরেশ এখনো অসুস্থ, এখনো সে এসে পঁহুছায় নাই।"

আমি পত্র হাতে করিয়া ট্রেণ হইতে নামিলাম। বেহারা "ললিত বাবা ইধার আও" বলিয়া ডাকায় একটি ৬।৭ বছরের ছেলে সেখানে আসিয়া লজ্জিতভাবে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল। বেহারা আমাকে রিক্স দেখাইয়া দিল, আমি তাহাতে উঠিলাম। রিক্স দ্রুতগতিতে আমাকে লইয়া চলিল, ম্যাকেঞ্জি রোড্ ছাড়াইয়া অকলাণ্ড রোড্ দিয়া চলিল, তাহার কিয়ৎদূরে একখানি সুন্দর লতা-পুষ্পশোভিত দ্বিতল বাটীতে প্রবেশ করিল। রিক্স বাটীর সম্মুখে থামিতেই একজন নেপালী আয়া আসিয়া, আমায় অভিবাদন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে বলিল।

আমি তাহার সহিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিলাম। সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষ, যেখানের যাহা আবশ্যক সব প্রস্তুত ও সজ্জিত। আয়া আমার সকল দ্রব্যাদি আনিয়া সেই কক্ষের এক পাশে সাজাইয়া রাখিল। আমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আয়া আসিয়া

সংবাদ দিল "গোসলের পানি প্রস্তুত।" আমি উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলাম। তাহার পর আহারাদি সমাপন করিয়া বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভূমিতে বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেই অসহায়ের সহায় অনাথের নাথকে ডাকিতে লাগিলাম। আমার ক'দিন পথে ভালরূপে প্রার্থনা করা হয় নাই। আমার মায়ের মৃত্যু-কালের শেষ অনুরোধ—"প্রার্থনা করিতে ভুলিও না।" আমি তাহা কখনো ভুলিতে পারি না, পারিব না।

আমি সেইভাবে কতক্ষণ বসিয়া ছিলাম জানি না, সহসা আমার নিকট বস্ত্রের খস্ খস্ শব্দে আমি চাহিয়া দেখিলাম, আমার সম্মুখে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত একটি রমণীমূর্ত্তি। তিনি আমাকে বলিলেন—

"ওকি? তুমি কি ঘুমাইতেছিলে? না প্রার্থনা করিতেছিলে?"

আমি শুষ্ককণ্ঠে কহিলাম, "প্রার্থনা।"

তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "এই সময়?" আমি বলিলাম, "সারাপথে তেমন সুবিধা হয় নাই।"

তিনি বলিলেন "আচ্ছা এসো আমরা ড্রইং রুমে যাই।" তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বারবার আমার প্রতি চাহিতেছিলেন। আমি বুঝিলাম ইনিই সুরেশের দিদি। আমরা ড্রইং রুমে প্রবেশ করিলাম। ড্রইং রুম নানা প্রকার ব্যাঘ্র ও মৃগচর্ম্মে সুসজ্জিত। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সুন্দর দ্রব্যে বাটীর চারিদিক ঘিরিয়া আছে। ড্রইং রুমের মধ্যে একটি গোল টিপাইয়ের উপর সুরেশের সেই ছবি (যাহা আমার নিকট ছিল)। আমি একবার তৃষিত দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলাম।

মিসেস্ বসু আগ্রহের সহিত আমায় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পথে কোন কষ্ট হইয়াছিল কি না জিজ্ঞাসা করিলেন অবশেষে বলিলেন, "আজ রাত্রেই হয়ত সুরেশ এসে উপস্থিত হবে। আচ্ছা তোমার বিবাহের কি সব চিঠি পত্রেই ঠিক হইল?" আমি লজ্জাবনত নয়নে ভূমির প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

তিনি পুনরায় কহিলেন, "আমি কল্পনায় মনে আনিতে পারি নাই, যে তুমি এত সুন্দর; সুরেশের কপাল ভাল।"

সেই শীতপ্রধান দেশেও আমার কপালে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

তিনি পুনরায় বলিলেন, "আমি আজ বার দিন হ'ল নোটিশ দিয়াছি, আর পাঁচ ছয় দিনের মধ্যেই তোমাদের বিবাহ হইবে। সুরেশ দার্জ্জিলিংএর নীচেই টি গার্ডেনে থাকে, এখান হ'তে ৮।১০ মাইল দূর। সেস্থান বড় নির্জ্জন, তা তোমাদের এখন নির্জ্জনই ভাল লাগিবে, কি বল? তবে তুমি মাঝে মাঝে আমার এখানেও আসিও। সেখানে কয়েক ঘর প্লান্টারস্‌রা সপরিবারে আছে। আমাদের দূর সম্পর্কীয় ভাই সুধীর সিভিলিয়ান, তিনি এখন ছুটি নিয়া এখানেই আছেন। তিনিই বিবাহের সব ঠিক করে রেখেছেন, সুরেশকে তিনি খুব ভাল বাসেন।" বিবাহে অনেক যৌতুক দিবেন স্থির ক'রেছেন।"

তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের ডিনারের সময় হইল, এবং দুজন রমণী ও দুজন পুরুষ সেই কক্ষে আসিলেন। মিসেস্ বসু তন্মধ্যে এক ব্যক্তির সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিলেন, বলিলেন "মিঃ বসু, ইনি মিস্ বসু, আমাদের সুরেশের ভাবী পত্নী"

মিঃ বসু চমকিত হইয়া বলিলেন, "সুরেশের?"

মিসেস্ বসু মৃদু হাসিয়া তীব্র কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন, "হাঁ, তা নয় ত কি?"

তিনি পুনরায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "সত্যি?"

মিসেস্ বসু অন্য কথায় সে প্রসঙ্গে বাধা দিলেন। সকলে আহারাদির পর থিয়েটার দেখিতে যাইবেন স্থির ছিল। আমাকেও লইয়া যাইবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি কোন মতে সেদিন যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায় অগত্যা সকলে ড্রইং রুমে আসিয়া বসিলেন। মিসেস্ বসু আমাকে বলিলেন, "মণিকা, তুমি কি বাজাতে জান?" আমি বলিলাম "জানি।" "গাহিতেও জান?" আমি নতমুখে বলিলাম "অল্প জানি।"

"আচ্ছা, তুমি একটিবার বাজিয়ে গান কর ত শুনি। আমি উঠিয়া বাজনার নিকট গেলাম। প্রথমে দুচারিটি ইংরাজী গত বাজাইলাম, সকলে একটি বাঙ্গলা গান গাহিতে অনুরোধ করায় গাহিলাম :—

"জীবনে কি আজ প্রথম এল বসন্ত,
অধীর সুখের ভরে পরাণ কেমন করে
খুঁজিব তাঁহারে আমি দিগ্ দিগন্ত।"

আমার গীত সাঙ্গ হইল। মিঃ বসু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মিসেস্ বসুকে বলিলেন, "এ গান চা বাগানের উপযুক্ত নয়, কি বল?"

মৃদু হাসিয়া মিসেস্ বসু বলিলেন, "তাহা সত্য।"

তাহার পর তাঁহারা সকলে থিয়েটার দেখিতে যাইবার জন্য উঠিলেন। মিসেস্ বসু বলিলেন :—

"সুরেশ হয়ত আজ রাত্রেই আসিবে, তুমি যতক্ষণ না ঘুম আসে এইখানে বসিয়া কিছু পড়, না হয় একটু বাজাও, একা তোমায় ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না।"

আমি বলিলাম, "আমি শ্রান্ত হয়েছি, এখনি বিশ্রাম করিতে যাব, আমার জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মিসেস্ বসুরা চলিয়া গেলেন। আমি কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই মুক্ত বাতায়নের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। আজই সুরেশ আসিবেন? দেখা হইলে কি বলিবেন? আমি কি প্রকারে কথা বলিব? আমি সেই টিপাইয়ের উপর রক্ষিত ছবিটী হাতে তুলিয়া লইলাম, সে মুখ দেখিয়া আমার রুদ্ধ ভালবাসা যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ইঁহাকে ভাল না বাসিয়া কি থাকা যায়? ওই যে দুটি সুন্দর সরল নয়ন, কি মোহময় দৃষ্টি। কতক্ষণে সাক্ষাৎ হইবে কেবল তাহাই মনে হইতে লাগিল। আমার জীবনের স্বপ্ন পূর্ণ হইবে, মিসেস্ দত্ত বলিয়াছিলেন, "তোমার ভালবাসা সুপাত্রেই পড়িয়াছে, তুমি ধন্য হবে।" সত্যই আমি ধন্য হব।

আমি মোহমুগ্ধ হইয়া পিয়ানোতে হাত দিলাম। আমার সুপ্ত হৃদয়ের শত বাসনা সেই বাদ্যের হৃদয়ে বাজিয়া উঠিল। আমার হৃদয়ের কত শত ভাবরাশি কত সঙ্গীতের সুরে বাজিতে লাগিল। আমার স্মরণ নাই কতক্ষণ বাজাইলাম। অবশেষে আমি যখন

"আমার পরাণ যাহা চায়
তুমি তাই, তুমি তাই গো।"

এই গীতটি বাজাইয়া শেষ করিলাম, এমন সময় গৃহদ্বার অল্প উন্মুক্ত করিয়া সেই নেপালী চাকর বলিল, "মিঃ রায় সাহেব।"

আমি চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার হৃদয়ের ভাবের আর কিছু স্থিরতা নাই, শুধু কম্পিত হইয়া উঠিল। যাহা ভাবিয়াছিলাম সব ভুলিয়া গেলাম। কক্ষ-দ্বার মুক্ত হইয়া গেল, আমার মানসের প্রণয় দেবতা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিস্মিত ভাবে আমার প্রতি নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। আর অগ্রসর হইলেন না, আমি অগ্রসর হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলাম,—"সুরেশ!"

তিনি একটু সরিয়া বলিলেন, "না সুধীর! সুরেশ আজও আসিতে পারিল না, কাল সকালেই আসিবে, তাই বলিতে আসিয়াছি।" সুরেশ নয় সুধীর! তবে আমি কার জন্য এত দূরে, এত আশায় আসিলাম? আমার হৃদয়ের মাঝখানে কে যেন জ্বলন্ত লৌহখণ্ড দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিল। আমি কার জন্য আমার প্রণয়ের ডালা সাজাইয়া, কাহার আশায়, কাহার প্রেমের কামনায় বসিয়াছিলাম? কে আমাকে সেই সুখস্বপ্নের সপ্তমস্বর্গ হইতে গভীর পাতালে ফেলিয়া দিল? আমার আর মুখ তুলিয়া কথা কহিবার শক্তি ছিল না।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আপনি কি সুন্দর বাজাইতে পারেন, আমি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বাহিরে দাঁড়াইয়া, আপনার বাজনা শুনিতেছিলাম।"

আমি সাহসে ভর করিয়া টিপাইয়ের ছবিটি তুলিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "এটি কি আপনার ছবি?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি বিলাত হইতে আসিবার সময় তুলাইয়াছিলাম।"

আমার হস্ত সুস্পষ্টরূপে কম্পিত হইল। আমি

অতি সন্তর্পনে সে ছবি টিপাইয়ের উপর রাখিয়া দিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি যদি আর একটু বাজান ত' আমি বড় সুখী হইব। আর একটি গৎ বাজাইবেন কি ?"

আমি আমার মনের চঞ্চলতা লুকাইবার এমন সুন্দর উপায় দেখিয়া, পিয়ানোর নিকট বসিলাম ও ইংরাজীতে 'প্রণয়ের মৃত্যু সঙ্গীত' শীর্ষক গৎ বাজাইলাম। বাদ্য শেষ হইলে মিঃ রায় উঠিয়া বলিলেন, "অতি সুন্দর, কিন্তু আপনার এ গান কেন ?"

আমি বলিলাম, "অনেক রাত্ হইয়াছে, যদি কিছু মনে না করেন, আমি বিশ্রাম করিতে যাই।"

মিঃ রায় অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত বলিলেন, "আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমার আজ আপনাকে অনুরোধ করা অন্যায় হইয়াছে। আমি কাল সকালেই সুরেশকে আনিয়া হাজির করিব।" তিনি মৃদু হাসিয়া সম্ভ্রমের সহিত মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমি আপনার নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। তখনও মিসেস বসুর সেই নেপালী আয়া আমার অপেক্ষায় বসিয়াছিল। আমি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সে আমাকে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

আমি তাহাকে বিদায় করিলাম, বলিলাম আমি নিজেই সব দেখিব, সে গম্ভীর ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া বিদায় হইল। আমি কম্পিত হৃদয়ে শয্যায় শুইয়া পড়িলাম। আমার হৃদয় যেন জ্বলিয়া উঠিল, একি হইল ; একি প্রহেলিকা ! আমি কাহাকে ভাল বাসিয়া, কাহার চরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া আবার কাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছি। আমার হৃদয়ের প্রণয়-দেবতাকে কি প্রকারে স্থানচ্যুত করিয়া অন্যকে সেই স্থানে বরণ করিব। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ের ভিতর চাহিলাম, সেই এক মুখ, আর কিছু নাই। আমি কোন মতে অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না। আমার কুমারী জীবনই আমি বহন করিব। জগদীশ্বর আমার অদৃষ্টে যাহা লিখেন নাই, আমি কি প্রকারে তাহার অধিকারী হইব ? আর সুরেশ, তাঁর একি কাজ ? তিনি কোন্ সাহসে লজ্জার মাথা খাইয়া অপরের প্রতিমূর্ত্তি নিজের বলিয়া পাঠাইলেন ? তাঁহার কি ভয় সঙ্কোচ হইল না ? আমি পিতৃমাতৃহীনা, সহায়-সম্পত্তি-হীনা, পরাশ্রয়ে, পরানুগ্রহে পালিতা বলিয়া কি আমার নিজের কিছু আত্ম-মর্য্যাদা নাই ? তিনি আর কোন্ সাহসে আমার সম্মুখে আসিবেন ? এ প্রবঞ্চনার, এরূপ জঘন্য নীচতার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ? সুরেশের প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা জন্মিল, সে নামও আমার নিকট বিষবৎ মনে হইতে লাগিল।

আমি এখন কি করিব, কোথায় যাইব ? প্রাণান্তেও আমি সুরেশকে বিবাহ করিব না। আমি একাকী দার্জ্জিলিংএ কি অকূল সমুদ্রে পড়িলাম ! দার্জ্জিলিং আর অন্য স্থান কি ? আমার পক্ষে সকলই সমান। আমার মামীমা এ বিবাহ-ভঙ্গের পর আর কোন মতে স্থান দিবেন না। মামার মৃত্যুর পর হইতে আমার প্রতি তাঁহার ব্যবহারে কেবল নিষ্ঠুরতাই প্রকাশ পাইতেছে। আমার সহিত ভাল করিয়া কথা পর্য্যন্ত কহেন না। আমার এ বিবাহ ত তাঁহারই অনুগ্রহে এরূপ ভাবে স্থির হইয়াছিল। নতুবা কে কোথায় বিবাহের উদ্দেশে একাকিনী দেশ হইতে দেশান্তরে আসে ?

এখন আমার একমাত্র কূল মিসেস্ দত্ত। তাঁহার সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি, সেই সস্নেহ কথা আমার অন্তরে জাগিয়া উঠিল। আমি পরদিন প্রভাতেই তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিব স্থির করিলাম, কিন্তু তিনি কি কলিকাতায় আছেন ? তাঁহার স্বামী মধ্য-ভারতবর্ষে চাকরী করেন, যদি তাঁরা সেই দিনই চলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি হইবে ? আর মিঃ রায় সুধীর, তিনি যদি জানিতে পারেন আমি কেন সুরেশকে বিবাহ করিব না, কাহাকে বিবাহ করিবার বাসনায় আসিয়াছিলাম, তাহা হইলে কি হইবে ? আমার হৃদয় লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায় চূর্ণ হইতে লাগিল। আমার মুখের সুধাপাত্র সহসা ভাঙ্গিয়া গেল। আমার তৃষিত হৃদয়ের সম্মুখে অদৃষ্ট পরিপূর্ণ আশাবারি আনিয়া লোভ দেখাইয়া, পুনরায়

নিরাশার ধূ ধূ মরু ফুটাইয়া দিল। আমার একি ভীষণ দুর্ভাগ্য!

সারারাত প্রায় অনিদ্রায় কাটাইলাম। ভোরের বেলায় শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। যখন চক্ষু মেলিলাম, দেখি যে কাঁচের স্কাই লাইটের মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ শয্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, অপ্রকৃতস্থ হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া গত রাত্রের কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম। এমন সময় মিসেস্ বসু গৃহে প্রবেশ করিলেন, আমাকে সেই ভাবে বসিতে দেখিয়া বলিলেন, "ওকি, তুমি কাল আর বস্ত্র পরিবর্ত্তনও কর নাই? অমনি শুইয়াছিলে? আয়া ছিল না?" আমি নিরুত্তরে রহিলাম। তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "একি, তোমার মুখ এত শুকাইয়া গেছে কেন? চোকের কোণে এত কালি পড়িল কিসে? কি হইয়াছে?"

আমি নীরবে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া আমার ট্রঙ্ক খুলিয়া সেই মোরাক্কোমণ্ডিত ফ্রেমে সযত্নে রক্ষিত ছবি খানি বাহির করিয়া বলিলাম, "এ কাহার ফটো?"

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "এত সুধীরের, তোমার নিকটে কি প্রকারে আসিল?" আমি ফ্রেম হইতে ছবিটি বাহির করিয়া তাহার পরপৃষ্ঠে লিখিত অক্ষর দেখাইলাম, তাহাতে লিখিত ছিল "মণিকাকে ভালবাসার সহিত দিলাম, সুরেশ।" মিসেস্ বসু চমকিত হইয়া ছবিটি হাতে লইয়া বলিলেন, "সে কি?"

আমি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, "আমি কাল মিঃ সুধীর রায়কে দেখিয়াছি, কাল আপনারা থিয়েটারে যাইবার পর তিনি আসিয়াছিলেন, সুরেশের সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন।"

"তাহ'লে তুমি এই ফটোর অঙ্কিত ব্যক্তিকে সুরেশ বলিয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছ?"

"হাঁ।"

"এখন ত জানিতে পারিয়াছ, সুরেশ ও সুধীর ভিন্ন, এখন কি করিবে?" আমি দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, "বিবাহ করিব না।"

মিসেস্ বসু আমার শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন, "ছিঃ, তুমি এখন সব বুঝিতে পার। সুরেশ নিশ্চয়ই তোমায় উপহাস করিয়া এ ছবি পাঠাইয়াছে, সে হয় ত ভাবিয়াছে ইহাতেই তুমি তাহাকে বেশ চিনিবে।"

"এরূপ উপহাস কি ভদ্রজনোচিত?"

"আচ্ছা, সুরেশ ত আজই আসিবে, তোমরা উভয়ে বুঝাপড়া করিও।" তিনি গম্ভীর ভাবে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একজন ভারত-নারীর নিবেদন।

শ্রীমতী বিদ্যারমনভাই নীলকণ্ঠ বি, এ, কর্ত্তৃক জাতীয় সামাজিক সমিতিতে বিবৃত।

(ইংরাজী হইতে অনুবাদিত)

ভারত-নারীর শিক্ষা, জ্ঞানোন্নতি ও স্বাধীনতা ভারতের সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির ভিত্তি-স্বরূপ। নারীকে এসকল হইতে বঞ্চিত করিলে এদেশের উত্থান অসম্ভব। শুধু পুরুষেরা উন্নত হইবেন, আর নারীগণ তাঁহাদের পৃষ্ঠে দুর্ব্বহ ভারস্বরূপ হইয়া থাকিবেন, অথচ দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে,—ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে বলিতে হইবে, যে বৃথাই জগতের উন্নতির ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। পুরুষের গতিবিধি পর্য্যন্ত মাতা, পত্নী ও ভগ্নীর দ্বারা মার্জ্জিত, গঠিত ও নিয়মিত না হইলে চলে না, আর ভারত-নারী অশিক্ষিত, অনুন্নত ও দাসত্বে আবদ্ধ থাকিলে তাঁহাদের পুত্র, পতি ও ভ্রাতৃগণ কিরূপে আলোক, স্বাধীনতা ও উন্নতি-লাভে সমর্থ হইবেন? এদেশের পুরুষগণ কি নারীগণ হইতে স্বতন্ত্র বাস করেন? তাঁহারা কি নারীর প্রভাব হইতে বিমুক্ত? ভারতের পুরুষগণ কি শৈশবে পুরুষের দ্বারাই প্রতিপালিত হয়েন? পুরুষেরাই কি তাঁহাদের সেবা করেন?

ভারতের গৃহ পরিবার কি সংসারত্যাগী বিরাগীর স্ত্রীজন-বিবর্জ্জিত সন্ন্যাসাশ্রম! এদেশে কি পুরুষ ও নারীর বাসের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপনিবেশ রহিয়াছে? যদি পুরুষকে নারীগণের মধ্যে বাস করিতে হয়, নারীর সঙ্গে মিশিতে হয়, নারীর সেবা ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে পুংমাত্রে আবদ্ধ শিক্ষা, স্বাধীনতা ও উন্নতির মূল্য কত? যদি শৈশবে পুরুষ-চরিত্রের প্রথম রেখাঙ্কন অশিক্ষিতা নারীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়, যদি তাঁহাদের উন্নত আকাঙ্ক্ষার মহত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ অশিক্ষিতা নারীর মত ও আদর্শ দ্বারা তাঁহাদিগকে বেষ্টিত থাকিতে ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইতে হয়, তবে পুরুষগণ জাতীয় উন্নতি সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ উন্নত পুরুষকার, ধারণার দৃঢ়তা ও চরিত্রের সারবত্তা কিরূপে লাভ করিবেন? আর, নারী কি মানসিক উন্নতি ও স্বাধীনতা লাভের অধিকারিণী নহেন? জ্ঞান কি পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতির ও বিধিদত্ত সম্পদ নহে? যে পরম পিতা জীবগণকে মন ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়াছেন, নারীজাতি কি তাহার সন্তান নয়? যদি তাই হয়, তবে তাঁহাদিগকে জ্ঞানালোকে বঞ্চিত করা কি পুরুষের কর্ত্তব্য?

কার্য্যগত জীবনের বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশে স্ত্রীজাতির শিক্ষার অভাব কি শোচনীয় ফলই উৎপন্ন করিয়াছে। এখন কি ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি পদে, প্রতি স্তরে ইহা অনুভূত হইতেছে না, যে শিক্ষিত নারীর সম্মতি ও সাহায্য ব্যতীত সংস্কার ও উন্নতি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব? সামাজিক সমিতির আলোচ্য বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে নারীর অজ্ঞানতা ও তজ্জনিত হীনতাই অল্পাধিক পরিমাণে এই সকল দুর্দ্দশার কারণ। বর্ত্তমান সময়ে দেশে যে সকল বিষয় আলোচিত হয় তাহার কোন একটী বিষয় গ্রহণ করুন। দৃষ্টান্ত স্থলে সমুদ্র যাত্রার বিষয়ই আলোচনা করা যাউক। এবিষয়ে নারীগণ যদি পুরুষের সহায় হইতেন, তবে পৌরহিত্য ও জাতিভেদের বিষদন্ত কি ভগ্ন হইত না? বিধবা বিবাহের কথা চিন্তা করা যাউক। নারীগণ যদি বিষয়টীর গুরুত্ব যথোচিত রূপে অনুভব করিতে পারিতেন, তাহা হইলে কি বিধবা বিবাহ প্রচলন-বিষয়ক চেষ্টা অধিকতর ফলবতী হইত না? বালবিধবা-গণের মাতাগণ এবং স্বয়ং বিধবাগণ যদি অধিকতর শিক্ষিতা হইতেন, তবে বিধবাবিবাহের পথ কত সুগম হইত? সাধারণের অযৌক্তিক নিন্দাকে অবহেলা করিবার মত তাহাদের যদি সৎসাহস থাকিত, প্রকৃত দায়িত্ব-বোধ থাকিত, তবে জাতীয় পুনরুত্থানের পথ অধিকতর সুগম ও সহজ হইত। বাল্যবিবাহের কথা ধরুন। কে না জানে, যে পরিবারের পুরুষদিগের যুক্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবল অশিক্ষিতা নারীদিগের আগ্রহাতিশয্যে অধিকাংশ স্থলে অপগণ্ড শিশুদিগকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়? এ বাধা সহজ বাধা নয়, উপেক্ষা করিবার মত বাধা নয়। এসকলের মূলে আমরা কি দেখিতে পাই?—নারীগণের উদার সুশিক্ষার অভাব। এক কথায়,—আমাদের নারীগণকে অজ্ঞতার হস্ত হইতে উদ্ধার করা সমাজ সংস্কারের একমাত্র পথ।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে জ্ঞান বিজ্ঞানে সুপণ্ডিতা রমণীর অভাব নাই। কিন্তু আমরা এখন আর প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ করি না। অতীতকে আমরা অত্যন্ত গৌরবাস্পদ বলিয়া শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অতীতের অনুসরণকে ভয়াবহ বলিয়া বর্জ্জনীয় মনে করি। প্রাচীনের প্রতি আমাদের সকল অনুরাগ আমাদিগকে প্রচলিত প্রথা সমূহের অধীনতা হইতে উদ্ধার করিতে অসমর্থ। আমরা মুখে বলি আমরা অতীতের গৌরবের দিন পুনরানয়ন করিব, কিন্তু নারীগণকে জ্ঞানালোকে বঞ্চিত করিতে একটুও কুণ্ঠিত হই না। মনু বলিয়াছেন, 'যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যতে রমন্তে তত্র দেবতা।' কিন্তু আমরা কিরূপে নারীগণকে পূজা করি? ভারতের পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কিরূপে নারীপূজা করেন? সকল জ্ঞানালোকে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া এবং কঠোর অবরোধে অবরুদ্ধ করিয়া নয় কি? এই রূপেই কি শ্রদ্ধাপরায়ণ ও পূজাশীল হইতে হয়? যদি আপনারা নারীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়েন, যদি নারীকে হেয় জ্ঞান করেন, তবে কি মনুর আদেশ লঙ্ঘন করা হয় না?

এরূপ করিবার কারণ কি? যাহাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে সেই পাত্রই শ্রদ্ধার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে,—ইহাই কি প্রকৃত কারণ নহে? যাহারা আপনাদিগের মানসিক আনন্দে ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যোগ দিতে অসমর্থ, তাহাদিকে শ্রদ্ধা, পূজা করা কি আপনাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে নাই? দেবতাগণ যে এই ভারত ভূমির প্রতি বিরাগ সম্পন্ন হইয়াছেন, এই দেশ যে অমঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? দেবতাদিগকে প্রসন্ন করিতে হইলে নারীগণকে পূজার্হ করিয়া তুলিতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার ফল অতি সুদূরব্যাপী; সুতরাং ইহার উন্নতি দেখিলে আমাদের গভীর আনন্দ হয়। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজ-সংস্কারকগণ এবিষয়ে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে তাহা ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন সকলেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেছেন এবং ক্রমেই অধিকসংখ্যক বালিকা বিদ্যালয়ে গমন করিতেছে। বিবাহের বাজারেও বালিকাদিগের শিক্ষার একটা মূল্য দাঁড়াইয়াছে। আমি জানি, একজন উচ্চবংশ-সম্ভূত রাজপুত স্বীয় কন্যার জন্য উপযুক্ত, শিক্ষিত, রাজকুলসম্ভূত বর পাইবেন, শুধু এই জন্য কন্যাকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট আগ্রহের সহিত যে সাহায্য করিয়াছেন তদ্ব্যতীত সমাজ-সংস্কারকগণের চেষ্টা ফলবতী হইতে পারিত না। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন ও স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যের জন্য শিক্ষিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আলোচনার জন্য একটী সমিতি গঠন করিয়া সেই সমিতির পরামর্শ অনুসারে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; এজন্য বিশেষ ভাবে এই গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্যই ত যথেষ্ট নয়। জাতীয় জীবনের সংসৃষ্ট অন্যান্য বিষয়ে যেমন, এই বিষয়েও তেমনি সাধারণকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনকার্য্যে ও প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধনে জনসাধারণকে অর্থ সাহায্যাদি দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। তার পর, শুধু বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করাই যথেষ্ট নয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই, যে অতি অল্প বয়সেই আমাদের বালিকাগণ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে। তাহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্য অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলন ও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এই প্রকারে, অবসর কালে, স্বাস্থ্যবিদ্যা, গৃহস্থালী ও শুশ্রূষা প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা আবশ্যক। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতা শুনিলে তাহাদের জ্ঞানস্পৃহা জাগ্রত ও মন প্রশস্ত হইবে। অবশেষে আমার নিবেদন এই, যে শিক্ষিত ভারতবাসীগণ যেন গভীর চিন্তা ও সহানুভূতি সহকারে এই গুরুতর বিষয়ে বিবেচনা করেন, কারণ ভারতের ভবিষ্যৎভাগ্য স্ত্রীশিক্ষার উপরই নির্ভর করিতেছে।*

ঊর্ম্মিলা।

লক্ষ্মণ। মিটিয়াছে আজ প্রিয়ে, নিখিল ভুবনে
চিরন্তন অভিলাষ মোর! কায়-মনে
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি কাননে কাননে,
দুরাধর্ষ শত্রুদেশে, সমর-প্রাঙ্গণে,
অনাহারে অনিদ্রায়, সর্ব্ব সুখ ত্যজি'
যে ব্রত সাধনে সদা আছিলাম মজি',

---

* শ্রীমতী বিদ্যারমনভাই নীলকণ্ঠ মহিপাত্রম্ বি, এ, গুজরাটি-বাসিনী। ইনি গুজরাটের সুবিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক স্বর্গীয় জোলানাথ সারাভাই মহাশয়ের দৌহিত্রী। সারাভাই মহাশয়ের অন্যতরা দৌহিত্রী সারদাসান্ত মেহ্‌তাও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের উভয়েরই স্বামী সুশিক্ষিত ও উদারমতাবলম্বী। সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও দেশহিতকর কার্য্যে ইঁহারা আপন আপন স্বামীর সাহায্যকারিণী। আমরা উভয় ভগ্নীরই প্রতিকৃতি আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার দিলাম।
ভাঃ মঃ সঃ।

অযোধ্যার সুপবিত্র রাজসিংহাসনে
অগ্রজে বসায়ে আজি সম্ভ্রমে যতনে,
হইয়াছে সে ব্রতের চির উদ্‌যাপন,
প্রাণেশ্বরি!

উর্ম্মিলা। হে আরাধ্য, জীবন-জীবন!
ধন্য তুমি, ধন্য তব সফল সাধনা
অতুলন। ভ্রাতৃ-স্নেহে উৎসর্গি আপনা
পালিলে যে ব্রত এই দীর্ঘকাল হায়,
সে ব্রতের পুণ্যময় শীতল ছায়ায়
সমগ্র অযোধ্যাবাসী ধন্য আপনারে
মানিতেছে আজি দেব। বিপুল সংসারে
তোমারি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রাতঃ-সমীরণে,
নবোদিত বালার্কের রক্তিম কিরণে,
বিহঙ্গের কল-স্বনে হয়ে প্রচারিত
তাহারেও করিতেছে ধন্য পুলকিত
ক্ষণে ক্ষণে! আমি যে গো অতি ক্ষুদ্র নারী,
মোরেও করেছে ধন্য মহিমা তোমারি
আজি দেব, সগৌরবে! কি কহিব আর
অযোগ্যা এ দাসী নাথ, নিতান্ত তোমার!
আজিকার এ মহান্ আনন্দ বাসরে
পাই না এমন ভাষা খুঁজিয়া সংসারে
যাহা দিয়ে এ আনন্দ, এ মহিমা তব,
প্রকাশিতে তব পাশে পারি অভিনব
হর্ষভরে প্রিয়তম!

লক্ষ্মণ। অয়ি শুচিস্মিতে!
প্রশংসার যোগ্য কর্ম্ম বল পৃথিবীতে
কিবা করিলাম আমি! যা' কর্ত্তব্য মম
তাই শুধু করিয়াছি রহি' দৃঢ়তম
লক্ষ্য পথে আপনার। ইহাতে আমার
বাস্তবিক গৌরবের কিবা প্রশংসার
নাহি কিছু প্রাণেশ্বরি! না করিলে মোর
বরঞ্চ ঘটিত পাপ অতীব কঠোর
কর্ত্তব্য-হেলন-দোষে!
কিন্তু বল প্রিয়ে,
যে দিন মায়ের পদে তোমায় অর্পিয়ে
হইলাম বনবাসী অগ্রজের সাথে
পিতৃ-সত্য পালিবারে, সেইদিন হ'তে
কেমনে এ দীর্ঘকাল একেলা নীরবে
যাপিলে, বিশ্বের চির হাসি কলরবে
আপনারে মগ্ন রাখি'! সেই কবে হায়,
যেন আধ-বিকশিত কুসুমের প্রায়
গিয়েছিনু দেখি তোমা। আজ সেই তুমি
রূপে গুণে আলোকিয়া মোর মনোভূমি
উঠিয়াছ ফুটি অনুপম! এ অপার
পার্থক্যের সুদীরঘ সময় তোমার
কি ভাবে হইল গত? পড়িত কি মনে
কোন দিন মোরে সখী? অয়ি অতুলনে,
অতুল কাহিনী সেই বারেক শুনিতে
হ'তেছে একান্ত সাধ; এ পিপাসু চিতে
কর শান্ত প্রিয়তমে! দাও পুরস্কার
এ অপার আনন্দের দিনে আজিকার
তাই শুধু!

উর্ম্মিলা। ক্ষুদ্র আমি নগণ্যা কামিনী,
অতি তুচ্ছ মোর সেই করুণ কাহিনী
কি শুনিবে প্রাণনাথ! কি কহিব আমি!
তথাপি কহিতে হবে—নিতান্তই স্বামি,
শুনিতে গো সাধ যদি! যা স্মরিতে মোর
অজস্র উথলি উঠে নয়নের লোর
অব্যক্ত ভাবের ঘোরে, তাই নাথ আজ
তোমারে কহিতে হবে! হে হৃদয়-রাজ,
শুন তবে!
তুমি যবে লইলে বিদায়
প্রথম অযোধ্যা হতে, সেই দিন হায়,
বুঝি নাই ভাল করে কি ঘটিল মোর!
সকলের অশ্রু সাথে তপ্ত আঁখি-লোর
মিশাইয়ে শুধু আমি করিনু রোদন
প্রাণেশ্বর! সবাকার মরম-বেদন
আমারেও তুলেছিল ব্যথিত করিয়া

সবাকার সাথে যেন! দেখি নি ভাবিয়া
মোর সুখ-সুধাকরে ধীরে ধীরে ধীরে
সুনিবিড় মেঘমালা ফেলিতেছে ঘিরে
অলক্ষিতে অকস্মাৎ! ক্ষুদ্র বালা আমি—
তখন বুঝি নি তুমি কত বড় স্বামী!
তার পর একদিন বসন্ত উষায়,
কোকিলের 'কুহু'-স্বনে, মলয়-বাত্যায়,
চক্ষের সম্মুখ হতে সহসা আমার
সরে গেল যবনিকা, নিখিল সংসার
বোধ হ'ল অভিনব, মনোহরতম!
সারা প্রাণ মন মোর বেড়ি' অনুপম
আকুল পিয়াসা-সাধ উঠিল জাগিয়া—
ঘনাগমে নদী-বক্ষে যেমতি নাচিয়া
জেগে উঠে ঊর্ম্মিমালা! তখনি হে নাথ,
সত্য পরিচয় মম হল তব সাথ,—
চিনিলাম তোমা! চতুর্দ্দশ বর্ষ তরে,
বুঝিলাম, অনাথিনী আমি! শূন্য ঘরে
প্রতি পল জ্বালাময় যুগান্তের মত
যাবে মোর; সধবার বৈধব্যের ব্রত
আমারে পালিতে হ'বে নির্ম্মম ধাতার
নিদারুণ অভিশাপে! জীবন আমার
উঠিল দুর্ব্বহ হ'য়ে!

কিন্তু প্রাণেশ্বর,
এ উচ্ছ্বাস শুধু ক্ষণতরে! তারপর
তোমার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, পূত ভ্রাতৃ-স্নেহ—
তব ওই তেজোদৃপ্ত কমনীয় দেহ,
সুনির্ম্মল মন-প্রাণ, সম্মুখে আমার
তুলিল উজ্জ্বল করি'!—স্বামিন্, এবার
পারিনু প্রকৃতরূপে চিনিতে তোমায়!
শান্ত হ'ল দগ্ধ হিয়া; বিপুল ধরায়,
প্রকৃতির নগ্ন হাস্যে, গৃহ-পরিজনে,
তব ওই সৌম্যমূর্ত্তি সহস্র বরণে
হেরিলাম আচম্বিতে; এক শশী যথা
তরল তটিনী বুকে হইয়া শতধা
বিকশিত অভিনব! সকলের কাজ,
সকলের সেবা-সুখ, হে হৃদয়-রাজ,
মনে হল তোমারই;—কায়-মন-প্রাণ
তোমারি সন্তুষ্টি আশে করিলাম দান,
তা'রি মাঝে আপনারে হইয়া বিস্মৃত!
জগতের প্রীতি রূপে হয়ে উদ্বেলিত
তব পূত ভালবাসা চারিদিক হ'তে
আমারে ফেলিল ঘেরি'! জীবনের পথে
মিশে গেল উভয়ের কর্ত্তব্য মহান্
আত্ম-ত্যাগে প্রিয়তম! হারায়ে গেয়ান
তব বিশ্ব-মূর্ত্তিখানি নয়নের জলে
লাগিনু করিতে পূজা, পলে পলে পলে;
দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ চলে গেল কোথা
নিঃশব্দ-চরণ-পাতে!

আজিকে দেবতা,
পূর্ণ মোর সে অর্চ্চনা পূর্ণ-সিদ্ধি মাঝ!
দাঁড়ায়েছ পাশে আসি'! আনন্দে বিস্ময়ে
তোমার এ হৃদিখানি তোমারেই ল'য়ে
করিতেছি সমর্পণ—কিছু নাহি আর—
লও তাই, হে আরাধ্য দেবতা আমার!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আদর্শ দাম্পত্য-জীবন।

বিংশ পরিচ্ছেদ—লক্ষ্ণৌ কলেজে দৈনিক জীবন।

লক্ষ্ণৌ কলেজে যখন তুমি উপস্থিত হইলে, তখন গ্রীষ্মকাল। সকালে স্কুল হইত। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে ছুটী পাইতে। আহারাদি বোর্ডিংএর ভৃত্যেরা প্রস্তুত করিত। সকল মেয়েরা একত্র আহার করিতে বসিত। বাসন তোমাদিগকেই মাজিতে হইত। আলো জ্বালিবার তেল প্রত্যেককেই ক্রয় করিতে হইত। স্নানের জন্য গরম জল চাহিলে তার জন্য দুপয়সা অতিরিক্ত দিতে হইত। তুমি নিজের ঘরে আগুণের বন্দোবস্ত করিয়া

জল বসাইয়া রাখিয়া অন্য কাজ করিতে যাইতে। গরম হইলে তাহা স্নানের জন্য ব্যবহার করিতে। সেখানে তোমার দৈনিক কাজ এইরূপ ছিল,—৪½টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত উপাসনা। ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে খাওয়া, বস্ত্র পরিধান ও ঘর পরিষ্কার করা। ৬টা হইতে ১০½টা পর্য্যন্ত স্কুল। ১০½টা হইতে ১২টার মধ্যে স্নান, আহার ও বিশ্রাম। ১২টা হইতে অপরাহ্ণ ৫½টা পর্য্যন্ত পাঠ। ৫½টা হইতে ৬টার মধ্যে আহার। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত নামপাঠ ও গান। ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পাঠ। ১০½টা হইতে ১১টার মধ্যে গান ও শয়ন।

মিস্ থোবর্ণ তোমাকে অন্যান্য ছাত্রীর মতন নিয়মের অধীন করিয়া রাখিতে চাহিতেন না। তুমি কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নিয়মের অধীন হইয়াই চলিতে। তোমার সঙ্গে শীঘ্রই তাঁহার অতিশয় বন্ধুত্ব হইল। তিনি তোমাকে ছাত্রীর মতন না দেখিয়া আপনার ভগিনীর মতন দেখিতে লাগিলেন। তোমার পার্শ্বে আসিয়া একাসনে বসিতেন। যতই তিনি বলিতে লাগিলেন, মিসেস্ রায় এ সকল নিয়মের অধীন নহেন, ততই তুমি নির্দ্ধারিত নিয়মগুলি দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে লাগিলে। ইহাতে তোমারও উপকার হইতে লাগিল। তুমি বাল্যাবস্থা হইতে কোনও কাজ কখনও নিয়মাধীন হইয়া কর নাই, কেহ নিয়মের কথা বলেও নাই; এ বিদ্যালয়ে সকলই নিয়ম। নিয়ম যদি পালন করিতে না শিখিতে তাহা হইলে সেখানে হয়তো অত দীর্ঘকাল থাকিতেই পারিতে না; জীবনের মহাব্রতের জন্য যাহা শিখিয়া আসিয়াছিলে তাহা আর শিখিবার অবকাশ হইত না।

তোমার পরিবারের কন্যারাও নিয়ম পালনে সক্ষম হইত না। এই বিষয়ে লক্ষ্ণৌ হইতে পরে তুমি লিখিয়াছিলে, "বাধ্যতা কে কি, বাল্যকালে তাহা কেহ শেখায় নাই। গোপনে সেই জন্য নিজেই কষ্ট পাইয়াছি। বাধ্যতাতে যে এত সুখ, তাহা জানিতাম না। মনে হইত, বাধ্য হইয়া চলিতে হইলে কেবল দুঃখসাগরে ভাসিতে হইবে। এখন দেখিতেছি সে আমার ভুল। এই এক নূতন জিনিষ দেখিতেছি, যাহাকে তিক্ত বলিয়াছিলাম, সেই হইল মিষ্ট, আর যাহাকে মিষ্ট বলিয়াছিলাম, এখন তাহাকে তিক্ত বলিয়া পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

তুমি সেখানে গিয়াই এমন উৎসাহের সহিত নিজের কাযে নিযুক্ত হইলে এবং সেই উৎসাহে ও উন্নত আকাঙ্ক্ষাতে তোমার পত্রগুলি এমন পূর্ণ থাকিত, যে তোমার পত্র পড়া আমার ও আমার বন্ধুদের একটি বিশেষ আনন্দের ব্যাপার হইল। প্রথম প্রথম আমাদের ভয় হইয়াছিল যে খ্রীষ্টানদের মধ্যে থাকিয়া তোমার নিজ ধর্ম্ম সাধন করিতে, ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যোগদান করিতে, কিছু বাধা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু তোমার পত্রে সে ভয় দূর হইল। শনিবারে লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াছিলে; রবিবারে সন্ধ্যার সময় স্বয়ং উদারহৃদয়া মিস্ থোবর্ণ তোমাদের সমাজে যাইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া দিলেন। তুমি তোমাদের ঘরের এক পার্শ্বে শাল্ দিয়া একটী ছোট দেবালয় করিয়া লইয়া লইয়াছিলে। লালরঙ্গের আশ্চর্য্য একটু ঘর দেখিয়া মিস্ থোবর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কি?" তুমি বলিলে "Prayer room"। মেম সাহেব শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, সকল মেয়েদের বলিয়া দিলেন, "মিসেস্ রায় যখন prayer করিবেন, কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।"

উৎসাহের সহিত তুমি পড়িতে লাগিলে। হিন্দী ও ইংরাজী শিখিতে লাগিলে। প্রতিদিন স্কুলের ও বাড়ীর পাঠে প্রায় ১৪ ঘণ্টা অতিবাহিত করিতে। এ আশ্চর্য্য শক্তি কোথা হইতে আসিল! এই পাঠের চাপে তোমার চিরশত্রু নিদ্রা তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তুমি যেন নূতন যৌবন ফিরিয়া পাইলে। ভাই ফণী বলিয়াছিলেন, "এ বয়সে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিয়া লাভ কি?" আরও অনেকে এরূপ বলিতেন। তুমি তাঁহাদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিলে।

জ্ঞানে যে তুমি আমা অপেক্ষা খাট ছিলে, তাহা আমার ভাল লাগিত না। আমা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে দেখিতে ও জগৎকে দেখাইতে সাধ হইত, অন্ততঃ সমান সমান শ্রেণীতে দেখিতে ইচ্ছা ছিল। সে সাধ পূর্ণ মাত্রায় মিটে নাই, তাই ভগবান স্বয়ং তোমার শিক্ষার ভার

লইলেন। আমার সুখের সীমা রহিল না। সকলে পূর্ব্বে মনে করিতেন, যে আমিই বুঝি তোমাকে লইয়া যাইতেছি, এখন তাঁহারা দেখিলেন যে তোমার নিজের যাইবার শক্তি আছে; বিলক্ষণ শক্তি আছে। এ তোমার প্রশংসা নয়, মায়ের প্রশংসা বাড়িল। তাঁহারই নাম জয়যুক্ত হইল।

এপ্রিল মাসের মধ্যেই তোমার একখানি ইংরাজী পুস্তক শেষ হইল। এই সময়ে আমাকে একখানি পত্র লিখিয়া তাহার শিরোনাম ইংরাজীতে লিখিলে। মার্চ্চ মাসে একজন ইংরেজ ও তাঁহার পত্নী তোমাদের কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তুমি নির্ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলে; করিয়া তোমার নিজের খুব আনন্দ হইল।

মিস্ থোবর্ণ বলিলেন, তোমাকে প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া খেলিতে হইবে। তুমি প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়াছিলে, শেষে বুঝিলে শরীরের জন্য ইহাও প্রয়োজন। তিনিও তোমার মত মাথায় রুমাল বাঁধিয়া তোমার সঙ্গে খেলিতেন। এইরূপে তুমি খেলাও শিখিলে। ফিরিয়া আসিয়া তোমার পরিবারের বালিকাদের সঙ্গে এমন উৎসাহে খেলিতে, যে তোমাকে তাহারা আপনাদের একজন মনে করিত এবং প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ—দূরে না নিকটে?

১৮৯১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথমে তুমি লিখিলে, "এজগৎ একটী প্রকাণ্ড বাঙ্গলা; তাহার এক কামরায় তুমি, অন্য কামরায় আমি।" কোথায় দূরতা অনুভব করিয়া ক্রন্দন করিবে, তাহা না করিয়া এত নৈকট্য অনুভব কিরূপে করিতেছিলে? যদি এই নৈকট্য প্রকৃতরূপে বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে বিচ্ছেদের কষ্ট পৃথিবী হইতে একেবারে উঠিয়া যায়। লক্ষ্ণৌ গিয়া এই লাভ হইল, যে মৃত্যু তোমার পক্ষে সহজ হইল, পরকালে বিশ্বাস সহজ হইল।

অনেক সময় আমি প্রার্থনায় বলিতাম, যে আমি একটী আত্মাকেও ফিরাইতে পারিলাম না। তাই তুমি একদিন তোমার পত্রে সান্ত্বনা দিলে, "দুঃখ করিও না, অন্ততঃ একজনকে মায়ের ঘরে পৌঁছে দিলে।" একি কম কথা! স্ত্রীর মত সাক্ষী আর নাই। তুমি যে এ সকল কথা দূর দেশ হইতে লিখিবে, তাহা জানিতাম না। তুমি যে এত দূর গিয়া মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিবে, আবার নিজের দুটি ও অন্য এক ভাইএর একটি কন্যার ভার গ্রহণ করিয়া সমাহিতচিত্তে কয় মাস কাল অতিবাহিত করিতে পারিবে, তাহা পূর্ব্বে কেহ মনেও করে নাই। নিশ্চয়ই শান্তির আলয় যিনি, তাঁহাকে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছিলে।

আর এক পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, তুমি যেন পরলোকে গিয়াছ, সেখানে গিয়া আমাদের ব্যবহার দেখিতেছ, দেখিয়া বুঝিতেছ যে আমি নির্ম্মল ব্রহ্মচর্য্য লইয়া থাকিতে পারি, আর তোমার সন্তানদের যত্ন করিতে পারি। লক্ষ্ণৌ থাকিতে থাকিতে বুঝিতে পারিয়াছিলে, একেবারে চিরকালের মত দেহের অন্তরাল হইলেও আমাদের যোগ কাটিয়া যাইবে না, বরং বাড়িবে। যাহা তুমি ভাবিতে, আমিও তাহাই ভাবিতাম। তোমার পত্র পাঠ করিয়া—বাবু বলিলেন, ইহাতে তাঁহার অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতেছে। কুড়ি বৎসর হইল তাঁহার স্ত্রীর পরলোক গমন হইয়াছে। পরলোকের বিষয় তখনও তাঁহার নিকট অন্ধকার। তোমাতে আমাতে যে ব্যবহার হইতেছিল তাহাতে তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ পরিষ্কার হইতেছিল। আহা কত ভাল কথা! বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি সুখ হইতে পারে, যে একজনের মৃত স্ত্রীকে নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলে। * * * * *

আর একদিন তুমি লিখিলে, "দেখ মনে হইতেছিল আরও খাঁটি বিশ্বাসী না হইলে জগৎ আমাদের বিশ্বাস করিবে না। হাড়ের পরমাণু সকল যেন এখনও সেই খাঁটি সত্য বলিতে পারে না। তবে আমার হাড় বলিবে, "সত্যম্" "সত্যম্?" যে দিন তাই হইবে, জগৎকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। জননি, সেইদিন আনিয়া দাও, এই প্রার্থনা আজ ছিল। মায়ের কার্য্যের জন্য* যে কাহারও

* এবারকার বাঁকিপুরের মাঘোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য।

নিকট ভিক্ষা কর নাই, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু ইচ্ছাও করে, মায়ের সেবার জন্য ভাই বোন সকলেই মন মন প্রাণ দান করেন। আহা, কবে আমি তোমার হইতে পারিব? এখনও, প্রকাশ, তোমার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। সত্যই বলিয়াছ, এবার যেন দূর নিকট হইয়াছে; এ যদি না হইত, বিশেষ কষ্ট হইত। আর তো দূর নাই। প্রতিদিন ৪ টার সময় যখন নাম জপ করি, আশ্চর্য্য লীলা দেখি; তোমার নিকটে বসে সত্যই যেন নাম করিতেছি। মনে হয় না, যে তুমি দূরে। এইরূপে যখনই তোমাদের দেখিতে ইচ্ছা করে, তখনি মার কোলে দেখিতে পাই। পূর্ব্বে দেখিতে ইচ্ছা হইলে শরীর দেখিলে যেমন সুখ হইত, তার চেয়ে এখন কিছু কম বুঝিতে পারি না। বড়ই সুখ হয়। আমার বড়ই ভাবনা হইত, তুমি আগে যদি চলে যাও, আমি কি করে থাকিব? মা বুঝি আমার সেই কাতর ভাব লুকাইয়া দেখিয়াছিলেন, তাই তিনি জীবিত থাকিতেই দূরকে নিকট করিয়া দিলেন। আর কখনও যে তোমা হতে আমাকে দূরে থাকিতে হইবে না, এই যখন ভাবি, কত যে সুখ হয়, অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ। কঠিন সাধনের সমস্ত কষ্ট তখন সুখে পরিণত হয়। তুমি জান, তোমা হইতে দূরে থাকিবার কথা হইলেই কত কষ্ট হইত। তা বেশ হইয়াছে, আমার সাধ মিটিয়াছে। আর এখন কথায় নয়, এখন কার্য্যে পরিণত হইল। আর দুঃখ নাই, আর আমাদের বিচ্ছেদ অসম্ভব। এ বড়ই সুখের সংবাদ। যদি একজন লোকের সঙ্গে মিলিত হইতে পারিলাম,—সে জন কে? জ্ঞানী ধার্ম্মিক পুরুষ, আর আমি ক্ষুদ্র একটী প্রাণী,—তবে তাহা অপেক্ষা আমার আর সুখ কি হইতে পারে? এর চেয়ে সংসারে আর ভাল জিনিষ তুমি কি দিতে পারিতে? এখন ভাব, আমি বড়ই চতুর। যদি সংসারের সুখ তোমার নিকট চাহিতাম, এ অমূল্য চিরযোগ পাইতাম না। মার কৃপা ভাবিলে, প্রকাশ, আমার প্রাণ আর স্থির থাকে না, চক্ষে জল আর ধরে না। কেন তিনি এত ভালবাসেন জিজ্ঞাসা করিলে হাঁসেন, উত্তর দেন না; তারপরে বলেন, 'হইয়াছে কি? আরও বাসিব'। প্রকাশ! আমাদের একি হইল? লোকে যে পাগল বলিবে! আমিও সর্ব্বদা ব্যস্ত, যাহাতে আমার অমনোযোগে মার কার্য্য বন্ধ না হয়।"

আর এক দিনের পত্রে লিখিয়াছিলে, "তোমার ঘোরী প্রাণ থাকিতে কিছুতেই পিছুপাও হইবে না। তোমার ঘোরী কিছু জানে না; প্রকাশ! তুমি যাহা বলিয়া দিবে, এ দাসী প্রাণ দিয়া তাহা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে। এতদিন তবু যেন ভিন্ন ছিলাম, এখন যে আমরা বিবাহিত হইয়া * একটী হইয়াছি। আর কি এমন কঠিন কায মা দেবেন যা আমরা পারিব না? না পারি, করিতে করিতে তো যাইতে পারিব? মা তো আমাদের এমন কঠিন মা নন, যে যা না পারিব তাই দেবেন। তিনি জানেন যে আমরা কত দূর পারিব। যদি আমাদের দ্বারা তাঁহার কায করাইতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই পারিব। প্রকাশ! তোমার ঘোরীর সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তোমার ঘোরী তোমার মার কার্য্য যেন প্রাণ ঢালিয়া দিয়া করিতে পারে, আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমার সাধ পূর্ণ করিবার জন্য মা যে এ জীবন কিনেছেন, যখন ভাবি, তখন যে কি সুখ পাই, তোমাকে কি বলিব! আর বলিতে ইচ্ছাও হয় না। ইচ্ছা হয়, যা আমি ভাবি, সকলই তুমি বুঝিয়া লও। বলিতে অনেক সময়ে লাগে। যতই নিকট হইতেছি ততই আরও নিকট হইতে ইচ্ছা হয়। নৈকট্যের কি শেষ নাই? তোমার সহিত কথা বলিয়া বড়ই আরাম পাই; উঠিতে ইচ্ছা করে না। যখন আমি বাটী যাব তুমি আমার সঙ্গে খুব অনেকক্ষণ কথা বলিও। কেমন? চিরদিনই আমরা এই রূপে কথা বলিব, কেমন? তোমার ঐ কথাটী বড় ভাল লাগিল, যে এত দূরে, তবুও আমি যেন তোমায় মন্দ দুষ্ট খাইতে বারণ করিতেছি, আর তুমি তাহা শুনিলে। অনন্তকাল এইরূপে পরস্পরকে বারণ করিব, আর উভয়ের কথামত উভয়ে চলিব। দেখ দেখি কি সুখ! আমরা কি

* আধ্যাত্মিক বিবাহ অনুষ্ঠানের পর।

ঠকিয়াছি? না। এ সুখ যে অমূল্য। মা শেষ জীবনে বড়ই সুখী করিলেন। আমরা এখন প্রাণ দিয়া যাহাতে মার সেবা করিয়া মার নাম জয়যুক্ত করিয়া মাকে সুখী করিতে পারি, তাই করি।" * * * *

তোমার কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া আমি এই সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা করে কি?" তুমি বলিলে, "না, আমার এখন বাটী যাইবার ইচ্ছা হয় নাই, কারণ আমি যে কার্য্য করিতে আসিয়াছি তাহার এখন বিলম্ব আছে। কেবল তো দুখানি কেতাব পড়িতেছি।"

১৩ই জুন লিখিয়াছ, "এখন রাত্রি ১০টা। দানাপুরের সেই নদীর ধারের বারান্দায় আমার মন চলিয়া গিয়াছে; সেইখানে যে তোমরা উপাসনা করিতেছ।"

আর একদিন লিখিলে, "উপাসনার সময় সেই ঘর খানি, আর সেই লোক গুলি যেন আমার চারিদিকে থাকেন। আমি যেন ঠিক তোমার বাম দিকে বসিয়া উপাসনা করি। ভাগ্যে উপাসনা শিখাইলে, নইলে আজকের দিনে কি অবস্থা হইত বল দেখি? উপাসনার পর মনে হইতেছিল, এইরূপে উপাসনা শিক্ষা দেওয়া সকল স্বামীর উচিত।" এই উপাসনার গুণে দূর নিকট হইল, শুধু তাই নয়, সংবাদ না পাইলেও ব্যস্ততা চলিয়া গিয়াছিল। ৬ই, ৭ই আগষ্টের পত্র তুমি ৮ই পাইলে, এবং লিখিলে, "পত্র না পাইলেও মার নিকট সংবাদ পাই, সুতরাং আমার মন কেমন করে না। হয়তো তুমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পার না যে আমি এ কি বলিতেছি। আমিও যখন নিজের অবস্থা ভাবি, নিজেই আশ্চর্য্য হই। তোমার কোন দোষ নাই। মা মধ্যে মধ্যে আমাকে শিক্ষা দিবেন বলিয়া এইরূপ করেন। আমিও এখন সেয়ানা হইয়াছি, পত্র না পাইলে আর ব্যস্ত হই না। এমন কি, আজ পাঁচ মাসের মধ্যে কোন দিনও মেমকে জিজ্ঞাসাও করি নাই, আমার পত্র আসিয়াছে কি না? অনেক সময় ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে ও মার কৃপায় সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত হইতে দি না। পূর্ব্বে দুই দিন পত্র না পাইলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তার দিয়াছি; আর আজ একি পরিবর্ত্তন?"

পূর্ব্বে দোষ করিলে আমার মুখ ভারি দেখিতে, দেখিয়া তোমার মন অস্থির হইত। এখন আবার মা মুখ ভার করিতে লাগিলেন। একটী বেশী কথা বলিলে অমনি প্রখর দৃষ্টিতে তোমার পানে তাকাইতেন। তোমার ভালই হইল; একদিকে মা, অন্যদিকে ছেলে, মাঝ খানে তুমি। একদিন সমাজে গিয়া—সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথা কহিয়াছিলে। যতগুলি কথা বলা হইল তাহা না বলিলেও হইত, কিন্তু পূর্ব্ব অভ্যাসে পরিচালিত হইয়া অনেক কথা বলিলে। তখন মা কিছু বলিলেন না; কুটীতে আসিয়া শয়ন করিলে, কিন্তু কোন মতেই আরাম নাই। জিজ্ঞাসা করিলে "কি হইয়াছে?" মা বলিলেন, ভার মুখে বলিলেন, "তোমাকে বলিয়াছি, ওজন করিয়া কথা বলিও। কেন বে-ওজনে কথা বলিলে?" তৎপর দিবস প্রার্থনা করিলে, আর অনাবশ্যক কথা বলিব না।

বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার-চেষ্টা।

বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট অনেক চিন্তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, কখনো এ বিষয়ে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভব হয় না। সুতরাং কল্পনা জল্পনা আর কার্য্যে পরিণত হইবার অবসর পায় না। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এতদপেক্ষা বেশী কিছু আশা করিলেই বঞ্চিত হইতে হইবে। তাঁহারা যতটুকু করেন তজ্জন্যই তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথে অন্তরায় বহুবিধ। গবর্ণমেণ্টের নিকট উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবই সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় বলিয়া মনে হইয়াছে। এই জন্য তাঁহারা সম্প্রতি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুতের জন্য দুটী 'শিক্ষয়িত্রী কলেজ' প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনার জন্য কয়েক দিন হইল ছোটলাট মহোদয়ের ভবনে এক মন্ত্রণা-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সেই

সমিতির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে, যে কলিকাতা ও বাঁকিপুরে দুটী 'শিক্ষয়িত্রী কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতা কলেজে মাসিক ৫০০৲ বেতনে একজন ইংরেজ লেডি প্রিন্সিপাল ও মাসিক ৩০০৲ বেতনে একজন ইংরেজ প্রধান শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইবেন এবং মাসিক ১৫০৲ বেতনে একজন দেশীয় শিক্ষয়ত্রী নিযুক্ত হইবেন। যে বালিকা বিদ্যালয়ের সাহায্যে শিক্ষা-প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইবে সেই স্কুলে মাসিক ৩০০৲ বেতনে একজন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কলিকাতা কলেজের জন্য এক কালীন ১০০০৲ টাকা ও বার্ষিক ২৮,২৫৬৲ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বাঁকিপুর কলেজের জন্য মাসিক ৩০০৲ বেতনে একজন ইংরেজ শিক্ষয়িত্রী ও মাসিক ১৫০৲ বেতনে একজন হিন্দি-অভিজ্ঞা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইবেন। বাঁকিপুর কলেজের জন্য এক কালীন ৫০০৲ টাকা ও বৎসর ১০,৮৪৪৲ টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতা ও বাঁকিপুর উভয় কলেজেই ছাত্রীগণের জন্য মাসিক ৮৲ হিসাবে ১৫টী করিয়া বৃত্তি থাকিবে।

কলিকাতা কলেজের জন্য বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ৪ বৎসর কাল প্রতিবৎসর এক হাজার টাকা ও মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ৪ বৎসর কাল প্রতি বৎসর ২৫০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

বাঁকিপুর কলেজের জন্য পাটনার বাদশা-নবাব মহোদয় বার্ষিক ৭৪০০৲ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অর্থাভাব, সুতরাং দেশের সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অর্থ সাহায্যের উপরই 'শিক্ষয়িত্রী-কলেজ' প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইবে। বাঁকিপুরে যথেষ্ট অর্থের অঙ্গীকার পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং শীঘ্রই সেখানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। বঙ্গদেশেও অর্থ সাহায্যের জন্য শীঘ্রই আবেদন বাহির করা হইবে, সুতরাং আশা করা করা যায়, প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাইতে বিলম্ব হইবে না, কারণ গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং উদ্যোক্তা।

কিন্তু এখন কথা হইতেছে, বহু আড়ম্বর ও অর্থব্যয় করিয়া এই যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি না? আমাদের মনে হয়, এই কলেজ দ্বারা আশানুরূপ কায হইবে না। প্রস্তাবিত কলেজ সম্বন্ধে সঞ্জীবনী পত্রে "কোন বালিকা বিদ্যালয়ের পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত" একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটীর মধ্যে অনেকগুলি মূল্যবান্ কথা আছে, আমরা তাহার প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দীর্ঘকাল ইংরেজ আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন, দুঃখের বিষয় তাঁহারা এখনও আমাদের দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন না। নানা বিষয়ে তাঁহারা অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছেন। আমাদের দেশে মুসলমানগণ সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে কন্যাদিগকে প্রেরণ করেন না; হিন্দু সমাজেও বিবাহের পর কন্যাগণ বিদ্যালয় ত্যাগ করে। পণ-প্রথার অত্যাচারে কোন কোন স্থানে কন্যাগণকে একটু বেশী বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা হয় বটে, কিন্তু সে সব স্থলে অধিকাংশ বালিকা বিবাহের পূর্ব্বেই বিদ্যালয়ের সংশ্রব ত্যাগ করে। সাধারণতঃ ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্তই হিন্দু সমাজের বালিকাগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে। কোন ভদ্রলোকই প্রাচীন শিক্ষকের হস্তে এই বয়সের বালিকার শিক্ষার ভার অর্পণ করিতে অনিচ্ছুক নন। শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিলেই অভিভাবকগণ ১৪।১৫ বৎসরের বিবাহিত ও অবিবাহিত কন্যাগণকে বিদ্যলয়ে পাঠাইয়া দিবেন, ইহা সম্ভবপর নয়।" * *

লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিরোধ এদেশের প্রবাদবাক্য। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এদেশে বালিকা বিদ্যালয় সমূহে প্রজাপতি ও সরস্বতীর বিরোধ সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। প্রজাপতি আসিলেই সরস্বতী দেবী পলায়ন করেন। যখন প্রজাপতি কোন বালিকার প্রতি শুভদৃষ্টি করেন, তখনই সরস্বতী তাহার প্রতি বিমুখ হন। যতদিন এই প্রজাপতি ও সরস্বতীর বিরোধ ভঞ্জন না হইতেছে, ততদিন শিক্ষয়িত্রীই নিয়োগ কর, আর কলেজই খোল, অথবা ৫০০ টাকা বেতনে ইউরোপীয় প্রিন্সিপালই রাখ, কিছুতেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রকৃত ও প্রবল অন্তরায় দূরীভূত হইবে না। তবে এই অন্তরায় দেখিয়া, রাজা কি স্ত্রীশিক্ষার

তার পরিত্যাগ করিবেন? আমরা এমন কথা বলি না। আমরা বিশ্বাস করি, যতদিন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ অন্ধকারে থাকিবে ততদিন এদেশের কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, কোন বিষয়েরই পূর্ণাঙ্গ বা আশানুরূপ উন্নতি হইবে না। দেশকে দাঁড় করাইতে হইলে নারীজাতিকেও দাঁড় করাইতে হইবে। রাজা দেশকাল বিবেচনা করিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবেন।"

"দেশকাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া, কাজ করিলে গবর্ণমেণ্টের রাশি রাশি অর্থই অযথা ব্যয় হইবে। কলেজের জন্য যে টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া কথা হইতেছে, এই টাকা যদি বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করা যায়, বেশ ফলের আশা করা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট প্রধান প্রধান স্থানে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করুন, বালিকাগণকে বিশেষ ভাবে পুরস্কার ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করুন, প্রাচীন পণ্ডিতদিগকে ২০।২৫ টাকা বেতনে এই কাজে নিযুক্ত করুন।"

"গবর্ণমেণ্ট শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করিয়া, অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা দানের সংকল্প করিয়াছিলেন। অর্থাভাব কি অন্য কোন্ কোন্ কারণে জানি না, সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শেলাই শিক্ষা প্রদানের জন্যও বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর বিশেষ প্রয়োজন। এই সব কাজের জন্য শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা যে প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রয়োজনে এত বৃহৎ আয়োজনে ও বহু ব্যয়ে দুইটী কলেজ করার কোনই প্রয়োজন দেখি না। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে, সহজে ও অল্প ব্যয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিতে পারেন। কয়েক বৎসর গবর্ণমেণ্ট ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে একটি শিক্ষয়িত্রী-শ্রেণী খুলিয়াছেন। এই শ্রেণীর জন্য সরকার হইতে ১০০ টাকা মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। যদি এইরূপে বেথুন কলেজে, বাঁকীপুর ফিমেল স্কুলে এবং ঢাকা ইডেন্ ফিমেল স্কুলে শিক্ষয়িত্রী-ক্লাশ খুলিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করেন, তবে সহজেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য স্বতন্ত্র কলেজের কোনই প্রয়োজন হয় না।"

আমরা অবগত আছি, ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের ন্যায় আরও কোন কোন স্থানে শিক্ষয়িত্রী-শ্রেণী খোলা হইয়াছিল, যদি তাহাতে আশানুরূপ কাজ হইত, তাহা হইলে হয়ত প্রস্তাবিত কলেজ স্থাপনের প্রয়োজন হইত না। কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের বক্তব্য এই, যে কলেজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে যে কায হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই অর্থ অন্য প্রকারে ব্যয় করিলে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক কায হইতে পারিত।

অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের উপায় না করিলে জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হইবে না। শিক্ষয়িত্রীগণ বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে গিয়া অন্তঃপুরে শিক্ষা দিবেন, সে আশা সুদূর পরাহত। আমরা দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দেখিয়াছি। সেই অঞ্চলে প্রাচীন সচ্চরিত্র কয়েকজন পণ্ডিত গ্রামের প্রায় প্রতি গৃহস্থের পরিবারের সহিতই ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত। তাঁহারা প্রতি বাড়ীর কন্যা ও বধূগণকে প্রতিদিন এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রতি পরিবার হইতে এজন্য তাঁহারা মাসে ১৲ টাকা ২৲ টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন। আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, মালবার উপকূলে এই উপায়ে স্ত্রীশিক্ষা অতি সন্তোষজনক রূপে বিস্তার লাভ করিয়াছে। তরুণ-বয়স্কাদিগের মধ্যে সেই অঞ্চলে এখন সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক শতকরা দশটী আছে কি না সন্দেহ।

আমাদের মনে হয়, বঙ্গদেশেও ঐপ্রকার উপায় কার্য্যকরী হইতে পারে। অধিকবয়স্ক সচ্চরিত্র গ্রাম্য পণ্ডিতগণকে গবর্ণমেণ্ট যদি উপযুক্ত বেতন দেন, তবে তাঁহারা বঙ্গের প্রতি অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিতে যেরূপ সমর্থ হইবেন, আর কোন উপায়ে তাহা হইবে না। আমরা বেশ জানি, এই প্রকাণ্ড বঙ্গদেশের তুলনায় 'শিক্ষয়িত্রী কলেজে' অতি অল্প ছাত্রীই প্রবেশ করিবেন। আর যাঁহারা প্রবেশ করিবেন তাঁহারাও উত্তীর্ণ হইবার পর অধিক দিন শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। হিন্দু সমাজের অতি অল্পই মহিলাই এই কলেজে প্রবেশ করিবেন। লাটভবনের সম্মিলনীতে

মুসলমান মহিলাগণ সম্বন্ধেও শ্রী— বেগম সিরাজুল ইসলাম এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম ছাত্রীই কলেজের অঙ্গপুষ্ট করিবেন। বিবাহ হইয়া গেলে তাঁহারাও প্রায়ই শিক্ষকতা কার্য্য আর করেন না। সুতরাং এই কলেজ দ্বারা দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের বিশেষ কোনরূপ সাহায্য হইবে, আমরা তাহা মনে করি না। এই অর্থ ও শক্তি উৎকৃষ্টতর উপায়ে ব্যয়িত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয়, তাঁহারা এ দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দেশীয় উপদেষ্টাগণ বিশেষ চিন্তা ও সাধারণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিলেই ভাল হইত।

শ্রী—

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহীশুরে নারীর উচ্চশিক্ষা—দেশীয় করদ রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশুর বিশেষ উন্নত। নারীর উচ্চশিক্ষা বিষয়ে এই রাজ্য বঙ্গদেশ ব্যতীত সমগ্র ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষাও অগ্রসর। মহীশুরের বর্ত্তমান রাজমাতার যত্নে অনেক দিন হইল নারীদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য মহীশুরে "মহারাণীর কলেজ" নামে একটী মহিলা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধীরে ধীরে সেই বিদ্যালয়ের সাহায্যে মহীশুর-রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করিতেছে। সম্প্রতি এই বিদ্যালয় হইতে শ্রীমতী রুক্মিনী আম্মা ও শ্রীমতী রঙ্গাম্মা মান্দ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই সন্তানবতী গৃহিনী। শ্রীমতী রুক্মিনী আম্মা চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া কন্যার জননী। শ্রীমতী রঙ্গাম্মা পঞ্চ সন্তানের জননী। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শুনিয়াছি গুজরাটের শ্রীমতী রমনভাই নীলকণ্ঠও কয়েকটী সন্তানের জননী হইবার পর বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিলেন। বৃহৎ পরিবারের কর্ত্রী ও বহু সন্তানের জননী হইয়াও জ্ঞানচর্চ্চায় এতদূর উৎসাহ ও অনুরাগ বঙ্গনারীর অনুকরণীয়। সাধারণতঃ বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী মহিলার লেখাপড়া শেষ হয়। গৃহকার্য্যে প্রবেশ করিলেই অধীত বিদ্যা আমরা দিন দিন বিস্মৃত হইতে থাকি।

স্বর্গীয় ডাক্তার সথিয়ানাধন—আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত ডাক্তার সথিয়ানাধন জাপানে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইনি মান্দ্রাজের একজন স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। অস্পৃশ্য নীচ পারিয়া জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় চেষ্টা ও সদ্‌গুণে দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; হিন্দুসমাজে থাকিয়া সমাজ-বন্ধন অতিক্রম করা ও এত উন্নতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। কিছু দিন পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য তিনি আমেরিকায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় পথে জাপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমরা আমাদের মাননীয়া ভগ্নী শ্রীমতী কমলা সাথিয়ানাধনের এই বিপদে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। ইঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, সেবাপরায়ণতা ও উচ্চ জ্ঞানে ইনি এদেশের নারী সম্প্রদায়ের নিকট আদর্শ স্বরূপ। ইঁহার সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান ল্যাডিজ ম্যাগাজিন' (Indian Ladies Magazine) নামক মাসিক পত্র ইঁহার জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। অল্প বয়সে তাঁহার নারীজন্মের সর্ব্বপ্রধান দুঃখ বৈধব্য-ক্লেশ আরম্ভ হইল। শুনিয়াছি তাঁহার একটিমাত্র সন্তান। সেটী ও অল্পবয়স্ক বালক। কিন্তু শ্রীমতী সথিয়ানাধন উচ্চ-শিক্ষিতা ঈশ্বর-বিশ্বাসিনী নারী। এই বিপদে তাঁহার ভক্তি বিশ্বাস তাঁহার অন্তরে ধৈর্য্য, বল ও শান্তিদান করিবে, এই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের মাননীয়া ভগ্নীর এই বিপদে আমরা গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

ম্যাট্‌সিনির জননী।

AK8 170 2/2 227 Bd 280 Jul-1906

ভারত-মহিলা

The woman's cause is man's; they rise or sink
Together, dwarfed or God-like, bond or free;
If she be small, slight-natured, miserable,
How shall men grow?

Tennyson.

25 JUL 1

১ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩। | ১০ম সংখ্যা।

ম্যাট্‌সিনি।

(১)

"পিপ্পো।"

এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে একটী বিদেশী সন্তানবৎসলা জননীর প্রিয় সন্তানের বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইতেছি। সেই সৌভাগ্যশালিনী জননীর স্বদেশবৎসল সন্তান স্বদেশের জন্যই যৌবনের প্রারম্ভ হইতে চির-নির্ব্বাসন মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। কর্ত্তব্যপরায়ণা সন্তানবৎসলা জননীর পবিত্র স্নেহ সেই নির্ব্বাসিত, গৃহহীন, দারিদ্র্যক্লিষ্ট সন্তানকে কঠোর বিপদসঙ্কুল জীবনপথে যেন মন্ত্রপূত রক্ষাকবচের ন্যায় বেষ্টন করিয়া থাকিত। সকলের অজ্ঞাতসারে তিনি গোপনে নির্ব্বাসন-স্থানে সন্তানের জন্য অর্থ ও পরিচ্ছদাদি পাঠাইয়া দিতেন। বৃদ্ধ বয়সে কেহ তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার মুখ সন্তান-গৌরবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, এবং চিরবিচ্ছেদজনিত বিষাদমাখা আনন্দাশ্রুতে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইত। মহাপুরুষদিগের জননীগণ প্রায়ই সন্তানদের কার্য্যে সহায়তা করিতে পারেন না। কিন্তু দুই এক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। আমাদের বিদ্যাসাগর-জননী এবং কেশব-চন্দ্রের জননী তাঁহাদের সন্তানদ্বয়ের অসাধারণত্বের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনির মাতাও পুত্রের অসাধারণ জীবন-পথে পুত্রকে সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। জননী-কুলে ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা মহাপুরুষদিগকে জন্মদান করেন, এবং তাঁহাদিগের মহত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়া, তাঁহাদিগের কার্য্যে সাহায্য করিতে পারেন। এইরূপ মাতৃমূর্ত্তি দেখিলে পুণ্য হয়। "ভারতমহিলার" পাঠক পাঠিকাদিগকে ম্যাট্‌সিনি-জননীর প্রতিমূর্ত্তি উপহার প্রদত্ত হইল; বঙ্গীয় জননীগণ এই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া সন্তানদের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে ব্রতী হউন। নবযুগের জননীদের ইহাই নূতন সাধনা।

ইটালীর নারীগণ সাধারণতঃ বঙ্গমহিলাদেরই মত অত্যন্ত কোমলপ্রকৃতিসম্পন্ন। ম্যাট্‌সিনি-জননীরও সন্তানদিগের প্রতি সুগভীর প্রেম ছিল। কিন্তু সেই

প্রেম দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি অন্যান্য কোমলহৃদয়া জননীদিগের ন্যায়, সন্তানদিগকে অন্যায় আদর দিয়া অসার ক্রীড়ার পুতুল করিতে চাহিতেন না, বরং সপ্রেম ও সুদৃঢ় অনুশাসনের দ্বারা তাহাদিগকে কষ্টসহিষ্ণু ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। শৃঙ্খলায়, কর্ত্তব্যপরায়ণতায় ও প্রেমে ম্যাট্‌সিনি-পরিবার সুখ ও সৌন্দর্য্যের আবাসস্বরূপ ছিল। এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন মাতা। ম্যাট্‌সিনির পিতাও একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং শারীর-স্থান বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে স্বাধীনচেতা, দৃঢ়চিত্ত এবং প্রেমিক ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। তিনি অত্যন্ত উদারহৃদয় পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় দরিদ্রদিগের সেবায় ব্যয়িত হইত।

এইরূপ জনক-জননীর গৃহে, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২২এ জুন, ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরে ম্যাট্‌সিনির জন্ম হয়। শৈশবে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না; কিন্তু তিনি অত্যন্ত শান্ত শিষ্ট ও কোমলপ্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার বড় তিন বোন ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে "পিপ্পো" বলিয়া ডাকিতেন এবং অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। সুন্দর উদ্যানে রোপিত, সযত্নে সুরক্ষিত সুকোমল পুষ্পবৃক্ষের ন্যায় পিপ্পো দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অতি অল্প বয়সেই পিপ্পো অতিশয় পাঠানুরাগী হইয়া উঠিল।

শৈশবে একটি অতি সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল। একদিন তাঁহার মাতা একজন মহিলা-বন্ধুর সহিত বেড়াইতে যাইতেছিলেন। "পিপ্পো" মাতার হাত ধরিয়া সঙ্গে যাইতেছিল। যখন তাঁহারা একটী উপাসনালয়ের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন "পিপ্পো" মাতার হাত ছাড়িয়া দিয়া দৌড়িয়া সেই উপাসনালয়ের দ্বারদেশে গেল এবং একজন শুভ্রবেশ, শুভ্রকেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। মাতা নিকটে আসিয়া সন্তানের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইলেন। পিপ্পো মাতাকে কাছে দেখিয়াই, সেই সন্ন্যাসীকে কিছু দিতে বলিল। সন্ন্যাসী মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎসে, এই শিশু অসাধারণ লোক হইবে, ইহার যত্ন করিও।"

উত্তর কালে ম্যাট্‌সিনির জীবন যে বিশাল শাল্মলী বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার বীজ গৃহের মধ্যে, জনক জননীর ক্রোড়ে অতি শৈশবে রোপিত হইয়াছিল। মানব শিশু যেমন হাওয়াতে বাস করে ভবিষ্যতে তদনুরূপভাবে গঠিত হয়। ম্যাট্‌সিনি শৈশবে কি প্রকার পারিবারিক হাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

সে সময় ইটালীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। নানা খণ্ডে বিভক্ত, অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি বিভিন্ন বিদেশী ও অত্যাচারী রাজশক্তির অধীন, সকল প্রকার উন্নত অধিকার হইতে বঞ্চিত ইটালীবাসীগণ একদিকে শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট নিগৃহীত হইত, অপরদিকে আপনাদের মধ্যেও নানাপ্রকার ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া পরস্পরের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিত। মানুষ সাদা হোক্ আর কাল হোক্, স্ত্রী অথবা পুরুষ হোক্, ধনী অথবা দরিদ্র হোক্—মানুষ যে মানুষ বলিয়াই যথেষ্ট পরিমাণে প্রীতির ও সদ্ব্যবহারের পাত্র, এই হতভাগিনী ভারত-জননীর সন্তানদের মত, জননী ইটালীর সন্তানগণও সে সময় তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই পৈশাচিক অসাম্যের দিনে ম্যাট্‌সিনির গৃহে আসিয়া ছোট ও বড়, ধনী ও দরিদ্র সকলেই সমান আদর ও অভ্যর্থনা পাইত। বালক ম্যাট্‌সিনি পিতামাতার এই ব্যবহার দেখিয়া শিখিল, মানুষ মাত্রেই প্রীতির পাত্র।

স্বাধীনচেতা পিতা ও মনস্বিনী মাতা, দেশের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যখন আলোচনা করিতেন, তখন প্রজাতন্ত্রের কথা উঠিত। সে সময়ে কত গোপনে, কত শঙ্কিত চিত্তে দেশের উন্নতির বিষয়ে কথা বলিতে হইত। শাসনকর্ত্তাদিগের মতে স্বদেশের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা ও আলোচনাও দণ্ডনীয় বিষয় ছিল। এই অবস্থা যে কি প্রকার তাহা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে বুঝিতে

পারিতেছি। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল বালক পিপ্পো পিতা মাতার রাজনৈতিক আলোচনা শ্রবণ করিয়া, দেশের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ও ভবিষ্যৎ আশার বিষয়ে চিন্তা করিতে, পরাধীনতার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিতে, এবং স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইতে শিখিয়াছিল।

গৃহের এই প্রকার মহৎ প্রভাবের মধ্যে, বালক ম্যাট্‌সিনির অধ্যয়ন-মগ্ন জীবন নীরবে কাটিয়া যাইতে লাগিল। ১৬ বৎসর বয়সের সময়, একটা জাতীয় দুর্ঘটনার তরঙ্গ আসিয়া তাঁহার জীবনস্রোতকে কিছুদিনের জন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া দিয়া গেল।

কিছুদিন হইতে ইটালীর উদ্ধার সাধন উদ্দেশ্য লইয়া একদল স্বাধীনচেতা, নির্ভীক লোক গোপনে কার্‌বোনারো (Carbonaro) সম্প্রদায় নামে একটি দল গঠন করিয়া বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া, তাঁহারা ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিদ্রোহীগণ পরাজিত হন। তখন নেতাগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠেন। উক্ত বিদ্রোহের কতিপয় নেতা বিদেশ গমনের পথে কিছুদিন জেনোয়াতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি বিদ্রোহের সংবাদ জানিতেন। দেশের উদ্ধারসাধনে ব্রতী, সংগ্রামে পরাজিত বীরদিগকে দেখিয়া, তাঁহাদের চিন্তা ও দৃঢ়তা পূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, ম্যাট্‌সিনির মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাদের বিদেশ গমনের পাথেয় খরচের জন্য রাস্তায় অর্থ সংগ্রহ করা হইল, ম্যাট্‌সিনি তাহাও দেখিলেন। দেশের দুর্গতির কথা, পরাধীনতার কথা এবং দেশত্যাগী সেই স্বদেশ-সেবকদিগের কথা ভাবিয়া ম্যাট্‌সিনি একবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পড়াশুনা বন্ধ হইল। তিনি দিনরাত্রি উন্মত্তের ন্যায় দেশের চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, দেশের জন্য যাঁহারা প্রাণ দিতে উদ্যত, সেই বীরগণ এই ন্যায় সংগ্রামে কেন পরাজিত হইলেন? ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি স্থির করিলেন, তাঁহারা সকলেই যদি আপন আপন কর্ত্তব্য যথোচিত রূপে করিতেন, তাহা হইলে কখনই পরাজয় ঘটিত না। এই সময় তিনি পরাধীন জন্মভূমির জন্য শোকচিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ অবলম্বন করেন; তাহা আর জীবনে ত্যাগ করেন নাই। মাতা ম্যাট্‌সিনির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত হইলেন।

কিছুদিন এই ভাবে কাটিয়া যাওয়ার পর আবার ম্যাট্‌সিনি পূর্ব্বের ন্যায় পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ১৪ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বপ্রথম ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রথম দিন অস্ত্র-চিকিৎসা-গৃহে গিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সেই হইতে ডাক্তারী পরিত্যাগ করিয়া, আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। কলেজে আইন অধ্যাপনার কোনও প্রকার সুবন্দোবস্ত ছিল না। ম্যাট্‌সিনি নামমাত্র আইন পড়িতেন; এবং অধিকাংশ সময় কবিতা ও ইতিহাস পাঠ করিয়া কাটাইতেন। কিন্তু তিনি কোনও পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হ'ন নাই। তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের সহিত ভবিষ্যৎ জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমরা এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী নিগড়ে আবদ্ধ বলিতেছি; ইহার ফল ভোগ করিবার সময় এখনও আসে নাই। ম্যাট্‌সিনিকে গভর্ণমেণ্টের লৌহজাল-বেষ্টিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। জেনোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগকে শত-প্রকার গোঁড়ামীর ও কঠোর অনুশাসনের জালে জড়াইয়া এবং উচ্চ শ্রেণীর অধ্যয়ন হইতে দূরে রাখিয়া, তাহাদিগের স্বাধীনচিন্তা স্ফুরণের পথ একবারে অবরুদ্ধ রাখিতে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিত। কিন্তু ম্যাট্‌সিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়াই তাহার সকল বন্ধনজাল ছিন্ন করিয়া বন্ধুদের সহিত অনেকটা স্বাধীনভাবে পড়াশুনা করিতেন। কি জানি কেন, অধ্যাপকগণ ম্যাট্‌সিনিকে এ বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; অন্য কাহারও ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। পবিত্রতা, দৃঢ়তা, ন্যায়-পরায়ণতা, প্রীতি ও পরোপকারের জন্য তিনি উন্নত-প্রকৃতি ছাত্রগণের আকর্ষণের বস্তু, শ্রদ্ধার পাত্র ও নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠিলেন। সাহিত্য ও রাজনীতি

অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবার জন্য তিনি বন্ধুদিগকে লইয়া একটি সভা করিলেন। তখন সকল প্রকার উচ্চ চিন্তাপূর্ণ গ্রন্থপাঠ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ছিল। গভর্ণমেণ্টকে না জানাইয়া কোনও গ্রন্থ কেহ রাখিতে পারিত না। কাহার বাড়ীতে কি গ্রন্থ আছে, কে কোন্ গ্রন্থ পাঠ করে প্রভৃতি বিষয়ে পুলিশ দৃষ্টি রাখিত। এরূপ অবস্থায় ম্যাট্‌সিনি বন্ধুদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন বই পাঠ করিতেন, যে পুলিশ জানিতে পারিলে তাঁহাদের শাস্তি হইত। বাইবেল, দান্তে, সেক্সপিয়ার, গেটে, এবং হেগেল, ক্যাণ্ট্ প্রভৃতি তাঁহার প্রিয় পাঠ্য ছিল। কবিদিগের মধ্যে দান্তেই তাঁহার মনে জাতীয় উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি তাঁহার ভাবী জীবন-সঙ্গী জ্যাকোপো রাফিনীর সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার জীবনে এই বন্ধুর এবং ইহাঁর মাতার চরিত্র কতদূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, পরে তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া ম্যাট্‌সিনি আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ব্যবসায়ে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। কদাচ কখনও দরিদ্রদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেন মাত্র। সাহিত্যক্ষেত্রে জীবনের সমস্ত শক্তি ঢালিয়া দিয়া, জাতীয় সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের অনুপ্রাণনকারী করিয়া তুলিবার জন্য তিনি ব্যাকুলভাবে প্রস্তুত হইতেছিলেন। লিখিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস, কাব্য, নাটক প্রভৃতির ভিতর দিয়া সাহিত্যকে জাগাইয়া তোলা, তিনি তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইটালীর রাজনৈতিক দুর্গতির পানে তাকাইয়া, অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এখন কবিতা ও কাব্য লিখিবার এবং আলোচনা করিবার সময় নয়। লিখিতে হইবে, কিন্তু দেশের বিষয় লিখিতে হইবে; দেশ যাহাতে জাগ্রত হয়, এমন লেখা লিখিতে হইবে। সাধারণ সাহিত্যসেবীর আরামের পথ তাঁর জন্য নয়। স্বদেশের বক্ষে অত্যাচার ও অবিচারের স্রোত বহিয়া যাইতেছে, এখন এমন ধর্ম্ম, অথবা নীতি অথবা সাহিত্য চাহি না যাহা মানুষকে ঐ স্রোতের প্রতিরোধ করিতে সাহসী ও সচেষ্ট না করে। এইরূপ চিন্তা করিয়া, তিনি জাতীয় সাহিত্য-সংগ্রামক্ষেত্রে লেখনী-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ইটালীতে দুইটী বিপরীত সাহিত্যস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। এক শ্রেণীর সাহিত্য লোকদিগকে সকল প্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনভাব প্রভৃতি হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিত। অপর শ্রেণীর সাহিত্য সকল প্রকার বন্ধনজাল ছিন্ন করিয়া, সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন ভাব ও স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা প্রচার করিতেছিল। ম্যাট্‌সিনি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার ভাব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ম্যাট্‌সিনি বুঝিয়াছিলেন, জাতীয় উন্নতি ও স্বাধীনতার জন্য শক্তিশালী জাতীয় সাহিত্য কত প্রয়োজনীয়; তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে সাহিত্য লোকের মনে পাপ, অত্যাচার, অবিচার, অসাম্য ও পরাধীনতার প্রতি ঘৃণা এবং পুণ্য, প্রেম, ন্যায়, সাম্য ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগাইয়া দেয়, যে সাহিত্য নিরাশ হৃদয়ে আশা, নির্জ্জীব মনে শক্তি ও সাহস আনয়ন করে, সেই সাহিত্য পতিত দেশকে উঠাইবার মন্ত্রস্বরূপ। তাই তিনি সাহিত্যের সুকোমল ভাবের অংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও অসত্যের সংগ্রামের অংশ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, ইটালীবাসীদের স্বাধীন ভাবে কিছু লিখিবার বা বলিবার অধিকার ছিল না। যাহা কিছু মুদ্রিত হইত, তাহা দেখিবার জন্য স্বতন্ত্র রাজকর্ম্মচারী ছিল। ম্যাট্‌সিনির লেখার প্রতি অতি শীঘ্রই গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। তিনি সর্ব্বপ্রথম যে দুইটি পত্রিকায় লেখেন, সে দুখানি এক বৎসরের মধ্যেই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উঠাইয়া দেওয়া হয়। তারপর তিনি তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকায় "ইউরোপীয় সাহিত্য" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান। সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর, গভর্ণমেণ্ট পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করেন এবং শীঘ্রই তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। গভর্ণমেণ্টের অত্যাচার যতই বাড়িতে

লাগিল, সকল শ্রেণীর লোকদিগের মন স্বাধীনতা লাভের জন্য ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। এই স্রোতে পড়িয়া স্বদেশপ্রেমিক ম্যাট্‌সিনি ক্রমশঃ গভীরতর রূপে রাজনীতির আলোচনায় মগ্ন হইতে লাগিলেন।

এই সময় তিনি কার্‌বোনারো (Carbonaro) সম্প্রদায় ভুক্ত হ'ন। এ সময় এই সভার অবস্থা ভাল ছিল না। অনেকবার অকৃতকার্য্য হওয়ায়, ইহার মধ্যে অনেক শিথিলতা প্রবেশ করিয়াছিল; অথচ অনেক অস্বাভাবিক কঠোর নিয়ম ছিল। এই সম্প্রদায়ের কোনও সভ্য নেতাদিগের বিরুদ্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। যুবক সভ্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে নেতাদিগের অধীন হইয়া চলিতে হইত। সভার নেতাগণের নাম সভ্যগণ জানিতে পাইত না। কোনও স্পষ্ট উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কোনও কায করা হইত না। টাকা কড়ির হিসাব রাখা হইত না। সভার এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ম্যাট্‌সিনি ক্রমশঃ বুঝিতে পারিলেন যে, সেই সভার দ্বারা ইটালীর বড় বেশী কিছু হওয়ার আশা নাই। তবুও তিনি সভার সহিত কাজ করিতে লাগিলেন, এবং নূতন সভ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁর মনোমত যুবকদিগকে লইয়া একটী সুদৃঢ় দল গঠন করিবেন। ইতিমধ্যে চারিদিকে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল। ম্যাট্‌সিনিও বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অত্যন্ত গোপনে সকল কায চলিতে লাগিল।

সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই গভর্ণমেণ্ট বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ম্যাট্‌সিনি বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইলেন। বিচারে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি মাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু আইন অনুসারে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে দুইটি প্রমাণ না থাকিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। কাজেই বিচারকগণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি বিদ্রোহ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন কি না। ম্যাট্‌সিনি সব অস্বীকার করিলেন। হায়, ম্যাট্‌সিনি, কি করিলে? সেদিন সত্য কথা বলিয়া চিরবন্দী হইলে না কেন? তোমার পবিত্র চরিত্রে এ কলঙ্ক কেন লেপন করিলে? তুমিও মানুষ; বুঝিতে পার নাই, সত্য অস্বীকার করিয়া ক্ষুদ্র মানবীয় রাজশক্তির হাত হইতে নিজেকে বাঁচাইলে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বরাজের সার্ব্বভৌমিক আইনের নিকট বিদ্রোহী হইয়া রহিলে। সে আইন হইতে যে কোথাও নিস্তার নাই, তাহা ভুলিয়া গিয়া ম্যাট্‌সিনি ভাবিয়াছিলেন, অত্যাচারী রাজশক্তির সহিত মানুষের কোন প্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা নাই। তাঁহার জীবনে আরও দু'একটী ছোটখাট ভুল হইয়াছিল। দুর্ব্বল মানুষের পক্ষে জীবনসংগ্রামে অটল থাকা কি কঠিন!

বিচারে ম্যাট্‌সিনি এবং আরও কয়েকজন যুবক নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইল। সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হইল; কিন্তু ম্যাট্‌সিনিকে ৫ মাসের জন্য নির্জ্জন কারাগারে পাঠান হইল। ম্যাট্‌সিনির পিতা, জেনোয়ার শাসনকর্ত্তার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পুত্রকে কেন কারাগারে রাখা হইয়াছে। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন—"তোমার ছেলে একজন প্রতিভাশালী যুবক; সে প্রতিদিন রাত্রিতে একাকী নগরপ্রান্তে ভ্রমণ করে এবং গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়। আমাদের অজ্ঞাতসারে যুবকগণ যে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়, আমরা তাহা পছন্দ করি না। এ বয়সে তার এমন চিন্তার বিষয় কি আছে?" পাপীগণ, অত্যাচারীগণ চিরদিনই শূন্যে আতঙ্কের নানা কারণ প্রত্যক্ষ করিয়া অস্থির হয়। ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাহারা পাপকে যতই আলিঙ্গন করে, তাহাদের ধ্বংস ততই নিকটবর্ত্তী হয়।

পাপাতঙ্কভীত গভর্ণমেণ্ট, ম্যাট্‌সিনিকে পাঁচ মাস নির্জ্জনে বন্দী করিয়া রাখিয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—হয় তুমি কোনও পল্লীগ্রামে গিয়া বাস কর, নতুবা ইটালী হইতে নির্ব্বাসিত হও। তিনি পল্লীগ্রামে বাসরূপ জীবন্ত সমাধি অপেক্ষা নির্ব্বাসন শ্রেয় মনে করিলেন। এইরূপে ২৫ বৎসর বয়সে, স্বদেশের উদ্ধারের জন্য, তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। ইটালী পরিত্যাগ কালে, তিনি কেবলমাত্র মাতা পিতা এবং ভগিনীগণের সহিত

সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সুইজারল্যাণ্ড অতিক্রম করিয়া, ফরাসী দেশের লায়ন্স (Lyons) নগরে উপস্থিত হইলেন। জীবনের মহাব্রত আরম্ভ হইল। (ক্রমশঃ)

বেথুন-কলেজ-সম্মিলনী।*

অদ্যকার এই সম্মিলনী কি আনন্দপূর্ণ! এতগুলি শিক্ষিতা মহিলার একত্র সমাবেশ দেশের পক্ষে কি আশাপ্রদ! অদ্য এই মিলনের দিনে সর্ব্বপ্রথমে একবার প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায়ের কথা স্মরণ করি। ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন ভারতের সেই শোচনীয় দিনে যিনি জ্ঞানের বর্ত্তিকা লইয়া বিচরণ করিতেছিলেন, স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অশেষ করুণা কি আজ আমাদের চিত্তকে বিগলিত করিতেছে না? তিনি নারীজাতিকে কি গভীর শ্রদ্ধা করিতেন! তাঁহাদের দুঃখে, তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মহান্ হৃদয় সর্ব্বদা ক্রন্দন করিত। এই শোচনীয়, হীন অবস্থা হইতে তাঁহাদিগকে উত্থিত করিতে তিনি প্রাণগত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। আজ যে আমরা জ্ঞানালোকের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি, আজ আমাদের অবস্থা যে কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে কি সেই মহাপুরুষের পুণ্যময়ী স্মৃতির নিকট আমাদের মস্তক কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইতেছে না? তৎপরে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের নারীজাতির প্রতি অশেষ প্রেম একবার চিন্তা করি। নারীজাতির প্রতি তাঁহার ন্যায় গভীর সহানুভূতি, অপূর্ব্ব করুণা এ পৃথিবীতে অতি অল্প লোকেই দৃষ্ট হয়। তৎপরে এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা নারী-হিতৈষী মহাত্মা বেথুনের স্মৃতি আজ সকলের হৃদয়েই জাগিতেছে। বিদেশী হইয়া তিনি ভারতীয়া নারীগণের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রজ্জ্বলিত করিতে যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও যে অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন বিস্ময়ে আপ্লুত হয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সকল প্রকার বাধা, বিঘ্ন, উপহাস উপেক্ষা করিয়া এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তখন আমাদের দেশের অবস্থা বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা অতি হীন ছিল, লোকে নারীজাতিকে অতি হেয়জ্ঞান করিত এবং সন্দেহের চক্ষে দেখিত। দেশের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন মহাত্মা বেথুন মহান, উদার প্রেমে পূর্ণ হইয়া অসহায়া, দুঃখিনী ভারত-নারীর অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

অদ্য কি আমরা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছি না? সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য, অদ্য তাহা একবার হৃদয়ঙ্গম করি। জগতের সকল জাতিই উন্নতি-পথে কি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে! ইউরোপ, আমেরিকা এবং এই অল্প দিনের মধ্যে জাপানের মহিলাগণ সর্ব্ব বিষয়ে অসামান্য উন্নতি লাভ করিয়াছেন। এই সেদিন জাপানী মহিলাগণের অদ্ভুত, অভূতপূর্ব্ব স্বদেশ প্রেমের দৃষ্টান্তসকল আমাদের চক্ষের সম্মুখে জাজ্বল্যমান দেখিলাম। এই প্রায় ৪০ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা স্বদেশের কি উন্নতিই না করিতে সক্ষম হইয়াছেন? এই প্রাচীন, গৌরবময়ী ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরাই কি কেবল পশ্চাতে পড়িয়া রহিব? না, আমরা জ্ঞানালোকের আভাস পাইয়াছি, যাহাতে স্বদেশ এবং সমাজের হিতকারী হইতে পারি তাহার জন্য কেন যত্নশীলা হইব না? আমরা কেবল শিক্ষা পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকিব না, যাহাতে জগতের প্রয়োজনে নিযুক্ত হইতে পারি, ঈশ্বরের কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারি, তাহার জন্য যেন কৃতসংকল্প হই। স্বদেশের এই দুর্দ্দিনে স্বদেশের উন্নতিকল্পে জ্ঞানালোকপ্রাপ্তা মহিলাগণ যদি কার্য্য করিতে এবং কিঞ্চিৎ ত্যাগস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত না হন তবে তদপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? জ্ঞান লাভ করিয়া যদি স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি না পাইল, স্বদেশের মর্ম্মই না বুঝিলাম, তবে জ্ঞান লাভের সার্থকতা কোথায়? লোকে বলে নারীগণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া অলস, কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন, এবং বিলাস ও

* বেথুন-কলেজ-গৃহে বেথুন কলেজের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রীদিগের সম্মিলন-সভায় পঠিত।

আমোদপ্রিয়া হইতেছেন। আমাদের জীবন কি এই সকল অপ্রিয় কথার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সক্ষম হইবে না? নিশ্চয়ই আমরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়া আমাদের চরিত্র দ্বারা শিক্ষার গৌরব এবং মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারগ হইব। প্রকৃত জ্ঞান মানব-মনকে কখনও হীনাবস্থায় রাখিতে পারে না। আমরা কি জ্ঞানলাভ করিয়া মহান্ ও উচ্চ ভাবে পূর্ণ হইয়া প্রকৃত জীবনের আদর্শ দেখাইতে পারিব না?

আমাদের জীবন যেন কর্ম্মময়, কল্যাণকর, আদর্শ জীবন হয়। আমাদের জীবন দেখিয়া আমাদের দেশের লোক যেন শিক্ষার প্রকৃত সমাদর করিতে শিক্ষা করে। এখনও দেশের কত লোক নারীদিগের উচ্চশিক্ষা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন এবং ইহার ফলে আমাদের কত ভগিনী প্রকৃত উচ্চজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছেন। বর্ষে বর্ষে আমাদের এই প্রকার সম্মিলন যদি দেশের লোকের এই সন্দেহ এবং ঘৃণা অপনীত করিতে সক্ষম হয় এবং ইহা হইতে স্বদেশের কল্যাণকর ফল প্রসূত হয়, তবে নিশ্চয়ই এই সম্মিলনী সার্থক হইবে।

শ্রীকুমুদিনী মিত্র।

পুরাণ-প্রসঙ্গ।

মেঘনাদ বধ ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

আমার বয়স যখন বার তের বৎসর সেই সময় আমি কয়েক জন বৃদ্ধকে প্রায় প্রতিদিন অবসরকালে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া শুনাইতাম। আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহই সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে আমি এক সময়ে তাঁহাদিগকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত-প্রণীত "মেঘনাদ বধ" পাঠ করিয়া শুনাই। "মেঘনাদ বধ" শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং কোন কোন বিষয় লইয়া আমার সহিত ঘোর তর্ক করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, 'মেঘনাদ বধে' যে সকল কথা আছে সেগুলি ঠিক্ নয়। কারণ কৃত্তিবাসী রামায়ণে ওসকল কথা নাই। তাঁদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আপত্তির বিষয় হইয়াছিল, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদ বধের ব্যাপার। মাইকেল মধুসূদন লিখিয়াছেন, যে বিভীষণ সহ লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের পূজার ঘরে গিয়া নিরস্ত্র মেঘনাদকে আক্রমণ করেন, মেঘনাদকে অস্ত্র গ্রহণ করিবারও সুবিধা দেন নাই, এমন কি মেঘনাদের কোষার আঘাতে লক্ষ্মণ একবার অচেতনও হইয়া পড়েন। মেঘনাদের কোষার আঘাতে লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলেন শুনিয়া আমার উল্লিখিত শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এক জন অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠেন, "এ নিশ্চয়ই কোন ম্লেচ্ছের লেখা। লক্ষ্মণের মত বীর একটা কোষার আঘাতে মূর্চ্ছা যেতে পারেন? একি কুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া নাকি?" অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহেন, "ওহে ভায়া, তোমার 'গ্রন্থে ডুরী দাও।' তোমরা ইংরেজী পড়া লোক, মধুসূদনে যে কি মধু আছে তোমরাই ভাল বোঝ, আমাদের কৃত্তিবাস বুড়োই ভাল।" আমিও বৃদ্ধসম্প্রদায়ের উপর বিরক্ত হইয়া মধুসূদনের শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধে সে সময়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইলেও বলি যে, "আপনারা যাই মনে করুন, মূল সংস্কৃত রামায়ণে ঐ রকমই লেখা আছে। মধুসূদন খুব পণ্ডিত লোক।" সে সময় বাল্মীকির রামায়ণ কিন্তু আমি চক্ষেও দেখি নাই, বোধ হয় তখন আমার সংস্কৃতে বিদ্যা উপক্রমণিকা ব্যাকরণ।

বৃদ্ধগণের নিকট প্রিয় কবির মর্য্যাদা এবং আত্মগরিমা বজায় রাখিবার জন্য এক সময়ে যাহাই বলি না কেন, এখন দেখিতেছি যে মাইকেল মধুসূদনের যে "ঊর্ম্মিলা-বিলাসী" লক্ষ্মণ "রাক্ষসকুল-ভরসা অজেয়" মেঘনাদকে কৌশলে বিনাশ করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে নিঃশঙ্ক করেন, তাঁহার সহিত মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণের লক্ষ্মণের তুলনা হওয়া দূরের কথা, কৃত্তিবাসী রামায়ণের লক্ষ্মণেরও তুলনা হয় না। মধুসূদনের মধুচক্রে যত কিছু মধু ছিল, সবটুকুই রাবণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষসদিগের জন্যই ব্যয়িত হইয়াছে। রাক্ষস-বীরদিগকে বড় করিলেই যে

তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে খাট করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। ক্রুগার, ক্রন্‌জী, বোথা, ডিওয়েট্ প্রভৃতি বুয়ার বীরগণের শৌর্য্য বীর্য্যের প্রশংসা করিতে হইলেই কি ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট্‌স, কিচ্‌নার প্রভৃতিকে ভীরুতার অবতাররূপে চিত্রিত করিতে হইবে? মধুসূদন কিন্তু রাক্ষস-বীরগণকে বাড়াইতে গিয়া রাম লক্ষ্মণকে মাটি করিয়াছেন।

মধুসূদন যদি বাল্মীকির অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে তাঁহার মধু আমাদিগের এতদূর গাত্র জ্বালা উৎপাদন করিতে পারিত না। কৃত্তিবাস ঠাকুর লক্ষ্মণকে খাট করিয়াছেন, মধুসূদন লক্ষ্মণের শির মাটিতে ঠেকাইয়া তবে ছাড়িয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আজ কাল ইংরেজী শিক্ষিত লোকে ক্বচিৎ পড়েন; কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদ বধ" কাব্য ইংরেজি শিক্ষিত বাঙ্গালীর গলার হার। আমি মধুসূদনের কবিত্বের নিন্দা করিতেছি না, তিনি চিরদিনই বঙ্গ সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ।

মেঘনাদ বধ ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল এই দুইটি বিষয় "মেঘনাদ বধ" কাব্যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে ও বাল্মীকির রামায়ণে কিরূপ ভাবে বর্ণিত আছে সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতেছি।

বীরবাহু নিধনের পর রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। এ সংবাদে দেবকুল রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির জন্য বিষম চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা ও ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে বধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণে যত্নবান্ হইলেন, কারণ মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া যুদ্ধে প্রবেশ করিলে সমরে অজেয়। ইন্দ্র, হরপ্রিয়া ভবানীর নিকট গিয়া রাম লক্ষ্মণের বিপদের কথা নিবেদন করিলেন। তখন শিব তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। শিবের তপস্যা ভাঙ্গিয়া সকল কথা তাঁহাকে জানান হইল। শিব বলিলেন যে, "মহামায়ার নিকট যাও, তিনি ইন্দ্রজিৎ কেমন করিয়া মরিবে বলিয়া দিবেন।" অমনি ইন্দ্র মহামায়ার নিকট ছুটিয়া গেলেন। মহামায়া ইন্দ্রের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "যে অস্ত্রে কার্ত্তিকেয় তারকাসুরকে নিহত করেন সেই অস্ত্র লইয়া গিয়া লক্ষ্মণকে দিয়া আইস। লক্ষ্মণ সেই অস্ত্রের সাহায্যে মেঘনাদকে বধ করিবেন। কিন্তু মেঘনাদ মহাবলী, ন্যায় যুদ্ধে তাহাকে বধ করিতে পারে, এমন বীর ত্রিভুবনে নাই। আমি কল্য যুদ্ধে লক্ষ্মণকে প্রাণপণে রক্ষা করিব। তুমি এই অস্ত্র লইয়া লক্ষ্মণের নিকট যাও। ইন্দ্র চিত্ররথের হস্তে ঐ সকল অস্ত্র রামের নিকট পাঠাইয়া উহা দ্বারা কি করিতে হইবে বলিয়া পাঠাইলেন। এত করিয়াও ইন্দ্র নিশ্চিন্ত হইলেন না। এমন সময় মায়াদেবী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, "আগামী কল্য লক্ষ্মণ-হস্তে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, রাবণ ভয়ানক কুপিত হইবে, তখন কেমন করিয়া লক্ষ্মণকে রক্ষা করিবে, চিন্তা কর।" ইন্দ্র বলিলেন, "মেঘনাদ মরিলে পর, রাম লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবার জন্য আমি সুর সৈন্যসহ যুদ্ধ করিব।" এদিকে মহামায়া স্বপ্নদেবীকে বলিলেন যে, "তুমি আজ রাত্রে লক্ষ্মণকে স্বপ্নে এই বলিয়া আইস যে, 'লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজি মাঝে সরোবর তীরে যে চণ্ডীর দেউল আছে সেখানে গিয়া চণ্ডীর পূজা করিও, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" স্বপ্নদেবী মহামায়ার আদেশানুযায়ী লক্ষ্মণকে স্বপ্ন দেখাইয়া আসিলেন। লক্ষ্মণ স্বপ্নের কথা রামকে কহিলেন। রাম বিভীষণকে সে কথা বলিয়া এসম্বন্ধে বিভীষণের মত জানিতে চাহিলেন। বিভীষণ বলিলেন "লঙ্কার উত্তর দ্বারে চণ্ডীর দেউল আছে। লক্ষ্মণ অবশ্য সেখানে যাইবেন। দেবতার কৃপা না হইলে কি কার্য্যসিদ্ধি হয়?" তখন লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা পাইয়া সরোবর-তীরে চণ্ডীর দেউলে দানবদলনী মাতাকে পূজিতে চলিলেন। সেখানে গিয়া লক্ষ্মণ কত বিভীষিকা দেখিলেন, তাঁহাকে ভুলাইবার কত চেষ্টা হইল, কিন্তু লক্ষ্মণ অটল রহিলেন। অবশেষে লক্ষ্মণ দেবীকে পূজা করিয়া তাঁর নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। মহামায়া দেবী বলিলেন,

"সুপ্রসন্ন আজি,
রে সতী সুমিত্রাসুত! দেব দেবী যত
তোর প্রতি, দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে

বাসব, আপনি আমি আসিয়াছি হেথা
সাধিতে এ কার্য্য তোর শিবের আদেশে।
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজে বৈশ্বানরে।
সহসা শার্দ্দুলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে
নাশ তারে, মোর বরে, পশিবি দুজনে
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব
মায়াজালে আমি দোঁহে। নির্ভয় হৃদয়ে
যা চলি, রে যশস্বি!"

লক্ষ্মণ প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। রামের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিলেন, এবং মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য বিভীষণসহ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাইতে চাহিলেন। কিন্তু দেবকুলের এত সহায়তা সত্ত্বেও রামের মন উঠিল না। এই বিপদাবহ কার্য্যে প্রাণে ধরিয়া কেমন করিয়া যে লক্ষ্মণকে পাঠাইবেন তাই ভাবিয়া রাম অতিশয় কাতর হইলেন। লক্ষ্মণকে বলিলেন,

"দেব নর ভয় যার বিষে,
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প-বিবরে
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি,
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে!"

এবং ইত্যাকার আরও অনেক শোক করিলেন। লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন, "দেবতা আমাদের সহচর, চিন্তা করিবেন না। আপনি ধার্ম্মিক, আপনার কোন বিপদ ঘটিবে না।" বিভীষণও সেই কথা বলিলেন। তথাপি রামের মন বুঝিল না, তিনি লক্ষ্মণের ভাবী বিপদ আশঙ্কায় বড়ই কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময় দৈববাণী হইল যে, "অত ভাবনা কেন? শূন্যে চেয়ে দেখ।" রাম প্রভৃতি শূন্যে চাহিয়া দেখিলেন যে এক সর্পের সহিত এক ময়ূরের যুদ্ধ হইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে ময়ূরের মৃত দেহ ভূতলে পড়িল, রণজয়ী সর্প গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল। বিভীষণ বলিলেন, এই বার সকল সন্দেহ মিটিল। ময়ূর যখন সর্পের নিকট পরাজিত হইল, তখন নিশ্চয়ই ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইবে।" তখন রাম নিজ হস্তে লক্ষ্মণকে সাজাইলেন এবং লক্ষ্মণের মঙ্গল কামনায় অম্বিকার আরাধনা করিলেন ও লক্ষ্মণকে বিভীষণের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন।

দেব-বরে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ অন্যের অদৃশ্য হইয়া নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার অভিমুখে চলিলেন। ইন্দ্রজিৎ কৌষিক-বস্ত্র পরিধাণ করিয়া ষোড়শোপচারে ইষ্টদেবকে পূজিতে ছিলেন। এমন সময় লক্ষ্মণ ও বিভীষণ পূজাগৃহে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণের অসি ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন। তাঁর মনে হইল, বুঝি স্বয়ং অগ্নিদেব? লক্ষ্মণের রূপ ধরিয়া ভক্তকে দেখা দিয়াছেন। ইন্দ্রজিৎ বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্মণকে সেইরূপ ভাবে সম্বোধন করিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন,—

"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া
রাবণি, সংহারিতে বীর-সিংহ! তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম। দেহ রণ মোরে অবিলম্বে।"

একথা শুনিয়া ইন্দ্রজিতের বিস্ময় ও ভয়ের অবধি রহিল না। তথাপি তাঁর সন্দেহ দূর হইল না। তিনি কহিলেন, "আপনি লক্ষ্মণ হইবেন কেমন করিয়া? লক্ষ্মণ কি নিরাকার যে এই প্রহরী-বেষ্টিত পুরে প্রবেশ করিবে? অতএব প্রভু আর দাসকে বঞ্চনা করিবেন না, অনুমতি করুন, আজ লঙ্কার কলঙ্ক দূর করিব।"

লক্ষ্মণ কহিলেন,

"কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবণি,
* * * *
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে।"

এই বলিয়া "উলঙ্গিলা অসি ভৈরবে।"

একথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ বীরের মত উত্তর করিলেন,

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম-সাধ, অবশ্য মিটাব,
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ! প্রথমে এধামে,—

রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে,
সাজি বীরসাজে আমি, নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল-প্রথা আঘাতিতে তারে ;
এবিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে—কি আর কহিব ?"

এ কথার উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, তুমি পাপী রাক্ষস, তোমার সঙ্গে ক্ষত্রধর্ম্ম পালন করিব কেন ? "মারি অরি পারি যে কৌশলে।" লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রোষে, ক্ষোভে ইন্দ্রজিৎ কহিলেন,

"ক্ষত্র-কুল-গ্লানি, শত ধিক তোরে,
লক্ষ্মণ, নির্লজ্জ তুই ; ক্ষত্রিয়-সমাজ
রোধিবে শ্রবণ-পথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ, তস্কর যেমনি
পশিলি এ গৃহে তুই, তস্কর সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি।"

বলিতে বলিতে চক্ষের নিমেষে ভীম কোষা তুলিয়া লক্ষ্মণের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। কোষার আঘাতে লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত হইলেন,

"পড়ে তরুরাজ যথা প্রভঞ্জন বলে মড়মড়ে।"

তখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের ধনু ও অস্ত্র গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। দুয়ার পানে চাহিয়া দেখিলেন শূন্য হস্তে বিভীষণ দণ্ডায়মান। ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে প্রথম মিঠাকড়া রকম একটু ভর্ৎসনা করিয়া অবশেষে কহিলেন যে "দ্বার ছাড়িয়া দিউন, অস্ত্রাগারে গিয়া অস্ত্র আনয়ন করি। "পাঠাইব রামানুজে শমন ভবনে। লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।" বিভীষণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে অতিশয় তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বিভীষণের সহিত মেঘনাদের কথা কাটাকাটি হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ চেতনা লাভ করিয়া ইন্দ্রজিতের উপর তীক্ষ্ণ বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিরুপায় ইন্দ্রজিৎ পূজার উপকরণ গুলি লক্ষ্মণের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাও মহামায়া দেবী দূরে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণের গায়ে একটিও লাগিল না। অবশেষে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে এক খড়্গাঘাত করিলেন। সেই আঘাতে মেঘনাদ ভূতলে পতিত হইয়া লক্ষ্মণও বিভীষণের নিন্দা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মেঘনাদের মৃত্যুতে বিভীষণ একটু মায়া কান্না কাঁদিলেন, নহিলে ভাল দেখায় না। লক্ষ্মণ বিভীষণকে সান্ত্বনা করিলেন ; উভয়ে শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

লক্ষ্মণকে ফিরিতে দেখিয়া রাম অত্যন্ত খুসী হইলেন। ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছেন বলিয়া রাম লক্ষ্মণের এতই প্রশংসা করিলেন, যে লক্ষ্মণ বুঝি সে প্রশংসার তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। প্রশংসাটা এইরূপ ;—

"লভিনু তোমায় আজি তব বাহু বলে,
হে বাহু-বলেন্দ্র ! ধন্য বীরকুলে তুমি,
সুমিত্রা জননী ধন্য ! রঘুকুলনিধি
ধন্য পিতা দশরথ, ধন্য, জন্মদাতা তব।
ধন্য আমি তবাগ্রজ, ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা। এ যশ তব ঘুষিবে জগতে
চিরকাল।"

রাম প্রশংসাচ্ছলে লক্ষ্মণের নিন্দা করিতেছিলেন না ত ? বোধ হয় লক্ষ্মণের তাই মনে হইয়াছিল, কারণ ইন্দ্রজিৎ বধে লক্ষ্মণ যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন সে বিষয় তাঁর এবং বিভীষণের উত্তমরূপেই জানা ছিল।

মেঘনাদের নিধন সংবাদে রাবণ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং চতুরঙ্গ সৈন্যসহ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধে প্রবেশ করিলেন। সুরপতি ইন্দ্র রাম লক্ষ্মণকে সাহায্য করিবার জন্য সুরসৈন্যসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। রাবণ একে একে ইন্দ্র, যম, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি দেবরথীবৃন্দকে পরাজিত করিলেন। তখন

"হাতে ধনু ঘোর সিংহনাদে
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে।"

রামকে দেখিয়া রাবণ কহিলেন,—

"না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহি-নাথ, এভব মণ্ডলে

আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী
পামর? মারিব তারে, যাও ফিরি তুমি
শিবিরে, রাঘব শ্রেষ্ঠ।" নাদিলা ভৈরবে
মহেষ্বাস, দূরে শূর হেরি রামানুজে।

রাম রাবণের ঘৃণা ও দম্ভপূর্ণ কটূক্তি শুনিয়াও কিছু বলিলেন না, নিরীহ ভাল মানুষের মত সরিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণের সহিত রাবণের যুদ্ধ বাধিল। রাবণ লক্ষ্মণের যুদ্ধকৌশলে প্রীত হইয়া বলিলেন,—

"রাখানি
বীরপণা তোর আমি সৌমিত্রি কেশরী!
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্ সুরথি,
তুই, কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে।"

এই কথা বলিয়া রাবণ লক্ষ্মণের উপর শক্তিশেল নিক্ষেপ করিলেন, সেই শেলাঘাতে লক্ষ্মণ "সপরগ গিরিসম" পড়িয়া গেলেন। রাবণ অমনি লক্ষ্মণের মূর্চ্ছিত দেহ নিজ রথে তুলিয়া লইতে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই সময় শঙ্করের পদতলে শঙ্করী লক্ষ্মণের দেহ ভিক্ষা করিলেন। অমনি শিবের আদেশে বীরভদ্র অন্যের অদৃশ্যে রাবণের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। রাবণ ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে রাম লক্ষ্মণের শোকে তাঁহার অচেতন দেহের পার্শ্বে নীরবে ভূপতিত রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা পাইয়া রাম লক্ষ্মণের জন্য বহু বিলাপ করিলেন। এদিকে লক্ষ্মণের জন্য দুর্গা পুনরায় শিবকে ধরিয়া বসিলেন। শিবের আদেশে মায়াদেবী গিয়া রামকে কি উপায়ে যে লক্ষ্মণ বাঁচিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন। মায়াসহ রাম প্রেতলোকে গিয়া দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দশরথ বলিয়া দিলেন যে হনুমান গন্ধমাদন হইতে ঔষধ আনিলে সেই ঔষধি প্রয়োগে লক্ষ্মণ সুস্থ হইবেন। হনুমান গন্ধমাদন হইতে ঔষধ আনিলেন। লক্ষ্মণ সুস্থ হইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত।

পলিত।

দাঁড়াও দাঁড়াও ক্ষণ, লহ নমস্কার।
এখনি করো না ব্যাপ্ত তব অধিকার।
দেহ-ঋণ দেহ ঋণ, আর কিছু দিন,
তার পরে করে' লও তোমার অধীন।
দু-একটী কাজ আর দু-একটী গান
এখনো রয়েছে বাকী; হোক্ সমাধান;
তারপরে ওই তব পূত অধিকারে
শান্ত চিত্তে প্রবেশিব সেবিতে তোমারে,
রিক্ত-হস্ত দিও দেব আশীর্ব্বাদে ভরি,
মুছে দিও শেষ-লেশ বাসনা-লহরী।
দ্বন্দ-ক্লান্ত তাপ-রক্ত বিক্ষত-হৃদয়
অমৃত প্রলেপে দিও করে নিরাময়;
পুণ্যপ্রভা আলোকিত অই রাজ্যমাঝে
শুভ্র পরিচ্ছদ পরি যাব নিজ কাজে,
হে লোলিত, হে পলিত, হে হিম পাণ্ডুর!
যৌবন-জীবন-গ্লানি করে দিও দূর।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী।

অদৃষ্ট-লিপি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মিসেস্ বসু চলিয়া যাইবার পরই আমি টেলিগ্রাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। মিসেস্ দত্তকে লিখিলাম, "কাল বাহির হইব, ষ্টেসনে লোক রাখিবেন, টেলিগ্রামের উত্তর পাইয়া বাহির হইব।" আমি মুখ হাত ধুইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বারান্দার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম একখানি রিক্স দ্রুতবেগে আসিয়া মিসেস্ বসুর গৃহে প্রবেশ করিল। একটি ভদ্রলোক রিক্স হইতে নামিলেন। তাঁহার বেশভূষায়, আকার ইঙ্গিতে যেন কেমন দেখিলাম, তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই উচ্চকণ্ঠে বলিলেন শুনিলাম, "কই দিদি, মণিকা কোথায়?"

মিসেস্ বসু বিরক্তির সহিত বলিলেন, "সুরেশ, এদিকে শুনে যাও, তারপর মণিকা কোথায় বলিতেছি।"

সুরেশ! এই সুরেশ? সত্যই কি আমি ফটো দেখিয়া উন্মাদ হইয়াছিলাম? সুরেশের আকৃতি আমার আদতে মনে ছিল না, এখন সুরেশকে দেখিয়া তবু মনে পড়িল, তাঁহার চক্ষু অতি ক্ষুদ্র, তীক্ষ্ণ, তাঁহার ললাট ক্ষুদ্র, ফটোর সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরেই সুরেশ দ্রুতপদে সেই বারান্দায় আসিয়াই "আমার মণি কই" বলিয়া আমার প্রতি বাহু প্রসারণ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন। বন্য জীব দেখিলে ভয়ে যে প্রকার মনের ভাব হয়, তাঁহাকে দেখিয়াও আমার তদ্রূপ হইল। আমি সম্মুখে চেয়ার টানিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "একটু সাবধান হইয়া আসিবেন।"

তাঁহার সেই এলো-থেলো বেশ, অসংযত গতিতে স্পষ্টই বুঝিলাম যে তিনি প্রকৃতিস্থ ন'ন। তিনি আমার কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বেশ মেয়ে ত, আমি এত আশা করে ছুটে আস্‌ছি, আর আমার প্রতি এই ব্যবহার?" তাঁহার কথার সঙ্গে সেই স্থান সুরার দুর্গন্ধে পূর্ণ হইল। আমি কম্পিত হৃদয়ে ভাবিলাম, কি বাঁচাই বাঁচিয়াছি। এই লোকের স্ত্রী হইলে আর সুখের সীমা থাকিত না! আমায় নিরুত্তরে দেখিয়া তিনি আমার নিকট হইতে চেয়ার সরাইয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী মেয়ে, রাণী আমার, মণি আমার, একটু আদর করিতে দাও।"

আমি সজোরে হাত টানিয়া লইলাম, তিনি বিস্মিত হইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন, আমি কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, "সাবধান, আমার গায়ে হাত দিও না, তুমি প্রবঞ্চক, তোমার সহিত কথা কহিতে আমার ঘৃণা হইতেছে, তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া যাও।"

সুরেশ আমার কথা শুনিয়া ভীতি-বিহ্বল নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি মণি? তোমার ভালবাসার লোভে আমি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি তা'হলে কি ক্ষমা করিবে না?"

"তোমার কার্য্যের ক্ষমা নাই।"

"কেন, কি করিয়াছি?"

"কেন তুমি নিজের বলিয়া অন্যের ফটো পাঠাইলে?"

"এই শুধু! তা তুমি বুঝে' দেখ, আমার একটিও ভাল ছবি ছিল না, তাই আমি সুধীরের ছবি পাঠাইলাম, আর সকলেই ত বলে আমরা দুজনেই এক রকম দেখ্‌তে।"

আমার সে দুঃখ কষ্টের সময়ও হাসি আসিল, বলিলাম, "তা সত্য।"

সুরেশ পুনরায় বলিলেন, "তা যাহা হোক মণি, সেজন্য যা অপরাধ করেছি তার জন্য এই আমি যোড়হাত করে' তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

"আমি তোমায় ক্ষমা করিতে পারিব না, আমি তোমায় বিবাহ করিব না।"

"বিবাহ করিব না বলিলেই কি হয়? একি খেলা পেয়েছ, নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে। সুধীর আমাদের কত জিনিষ দিয়াছেন, আমাদের সব ল্যাম্প, কাঁচের বাসন, রূপার টি-সেট"—

আমি সে কথায় বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, "আমি তোমায় কোন মতে বিবাহ করিব না।"

"করিবে না? তুমি কোথায় যাইবে? এখানে কি করিবে?"

"আমি সে বিষয়ের পরামর্শ তোমার নিকট চাহি নাই, আমি যাহা ভাল বুঝিব তাহা করিব।"

"আর তোমার কোন হাত নাই, তোমায় বিবাহ করিতেই হইবে। আর চারদিন বাদে বিবাহ হবে, সব ঠিক, কোথায় সেই সিলন, আর কোথায় এই দার্জ্জিলিং। লোকে কি ভাবিবে? তুমি বিবাহ যদি না করিবে তা'হলে আসিলে কেন? তোমার কথা শুনিলে চলিবে না, তোমায় বিবাহ করিতেই হইবে।"

আমার হৃদয় মন অবসন্ন হইয়া পড়িল, একি ভীষণ পরীক্ষায় পড়িয়াছি, যাহা হউক আমি কখনো বিবাহ করিব না, আমি সে বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি, আমি পুনরায় দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, "আমি কখনো বিবাহ করিব না।"

সুরেশ বলিলেন, "তুমি জান, তোমার মামীমা এ সংবাদ পাইলে, ভবিষ্যতে তোমার সহিত আর কোনও সংশ্রব রাখিবেন না। তুমি একাকী বাঙ্গালীর মেয়ে এই বিদেশে কি করিবে?"

"আমার কোনও উপায় না থাকিলে, আত্মহত্যা করিব, তবু তোমায় বিবাহ করিব না।"

তখন নতজানু হইয়া অশ্রু-বিগলিত কণ্ঠে, কত মিনতি করিয়া কত নম্রভাবে সুরেশ বলিলেন, "তুমি আমায় রক্ষা কর, তুমি আমায় না রাখিলে জগতে আমার আর স্থান নাই। আমি প্রলোভনের পথে অনেক অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু তুমি আমার হৃদয়ের দেবি, তুমি আমায় ক্ষমা কর, সুধীরের ফটো পাঠাইয়াছি এই দোষ, কিন্তু আমি ত তোমারি। লক্ষ্মীমণি, তুমি আমায় রক্ষা কর।"

আমার হৃদয় জ্বলিয়া গিয়াছে, পাষাণের মত কঠিন হইয়াছে, সে কাতর প্রার্থনায় আমার মন বিচলিত হইল না, আমি বলিলাম "ইহজন্মে তোমার সহিত আমার এই শেষ সাক্ষাৎ। আমি প্রাণান্তেও তোমায় বিবাহ করিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর।" আমি দ্রুতপদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম।

তাহার পর পদশব্দে বুঝিলাম, সুরেশ চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার কক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া মিসেস্ বসু দ্বার খুলিতে বলিলেন। আমি দ্বার খুলিয়া দিলাম, তিনি আসিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "সুরেশ বলিল তুমি বিবাহ করিবে না বলিতেছ, একটি সামান্য কারণে কেন এরূপ করিতেছ?"

আমি বলিলাম, "আমি কোনমতে বিবাহ করিব না।"

তিনি বলিলেন, "আমি সমস্ত বৎসরের জন্য বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম, যেরূপ ঘটনা ঘটিল, আর ত এখানে থাকা হইবে না দেখিতেছি। তুমি কোথায় যাইবে?"

"আমার জন্য ভাবিবেন না। আমার একজন বন্ধুর নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলেই আমি কাল বাহির হইব।"

তিনি বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "কোথায় যাইবে?"

"আপাততঃ কলিকাতায়। আমার মামীমার নিকট আর আমার স্থান নাই, আমি সেখানে যাইতেও চাহি না।"

"কলিকাতায় কি করিবে?"

"চাকরীর চেষ্টা করিব, কোনও স্কুলে বা কাহারও বাড়ীতে যদি শিক্ষায়িত্রী হইতে পারি, দেখিব।"

"তুমি কি তা পারিবে?"

"না পারি দাসীবৃত্তি করিব, ভিক্ষা করিব, না হয় মরিব।"

"তবু এ বিবাহ করিবে না?"

"না, আমি কোনমতে এ বিবাহ করিব না।"

"তুমি ত ছবিকে বিবাহ করিতে রাজী হও নাই, সুরেশকে জানিয়াই ত রাজী হইয়াছিলে, এরূপ সামান্য কারণে কি এরূপ করা উচিত?"

এমন সময় আয়া একটি রূপার পাত্রে করিয়া একখানি টেলিগ্রাম আনিয়া আমার হস্তে দিল, আমি তাড়াতাড়ি টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে, "আসিও, আনন্দের সহিত গ্রহণ করিব, ষ্টেসনে লোক থাকিবে।"

আমি তাহা সযত্নে হস্তে ধরিয়া মিসেস্ বসুর কথার উত্তর দিয়া বলিলাম, "একি আপনার নিকট সামান্য হইল? আপনিও স্ত্রীলোক, আপনার নিজের হইলে কি করিতেন?"

"নিজে যা ভাল বোঝ তাই কর, আমি আর কি বলিব?" মিসেস্ বসু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কক্ষের বাহিরে গেলেন।

আমি সারাদিন ট্রঙ্ক ইত্যাদি গুছাইয়া স্থির করিলাম। বিবাহের পরিচ্ছদ ইত্যাদি দেখিয়া মিসেস্ বসু অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন, আজ আমার সেই সব দেখিয়া হাসি আসিল। অদৃষ্টের নিদারুণ উপহাস মনে করিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। আমি সারাদিন আর গৃহের বাহির হই নাই।

মিসেস্ বসুর আয়া আসিয়া বৈকালে আমার হাতে

এক পত্র দিল। মিসেস্ বসুর লেখা। পত্র খুলিলাম, উপরে কোন সম্বোধন নাই, এই কথা কয়েকটি লিখিত ছিল।

"দার্জ্জিলিংএর ট্রেণ সকাল ১০টার সময় ছাড়ে, টাইম্ টেবল্ পাঠাইলাম। ইহার সহিত এক শত টাকার একখানি নোট্ পাঠাইলাম, আপনার পথ খরচের জন্য ব্যয় করিবেন ও সময়ে ইচ্ছামত পরিশোধ করিবেন।

লীলা বসু।"

এরি মধ্যে আপনি সম্বোধন, আমার উপর না' জানি কিরূপ বিরক্ত হইয়াছেন, কিন্তু কি করিব? মিসেস্ দত্ত আসিবার দিন আমার হাতে ১০০ টাকার একখানি নোট্ দিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার বিবাহের যৌতুকের জন্য তাড়াতাড়িতে কিছু দিতে পারিলাম না, সেখানে 'বোসেকের' দোকান থেকে একটা হার কিনিয়া লইও।" সেই টাকার উপর নির্ভর করিয়া আমি এই ভীষণ সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আমি আয়ার হাতেই পত্রের উত্তর লিখিয়া দিলাম—

"মাননীয়াসু—

টাইম্ টেবল্ ও টাকার জন্য শত ধন্যবাদ। আপনার টাকা এই পত্রে ফেরত দিলাম। আমার প্রতি আপনার এই করুণার কথা চিরকাল মনে রাখিব, কৃতজ্ঞ থাকিব। টাইম্ টেবলটি গ্রহণ করিলাম, কল্য ১০টার ট্রেণেই যাইব। অনুগ্রহ করিয়া একখানি রিক্সের বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

অনুগতা মণিকা"

* * * * * *

সন্ধ্যার পর একবার গৃহ হইতে বাহির হইলাম। অন্ধকার রাত্রি, চতুর্দ্দিক মেঘে আচ্ছন্ন। চারিদিকে দীর্ঘ ঝাউ গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটু বেড়াইয়া শ্রান্ত দেহে অনেকটা আরাম পাইলাম। সেই স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে মন অনেকটা সুস্থির হইল। যখন আপনার কক্ষে প্রবেশ করিতেছিলাম, শুনিলাম বারান্দায় কাহারা কথা কহিতেছেন, ও আমার নাম করিতেছেন। আমি পর্দ্দার নিকট অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বরে বুঝিলাম, মিঃ সুধীর রায় বলিলেন, "কেন এমন হইল? সুরেশ ত তোমাদের বাড়ী হইতে গিয়া, একেবারে এক বোতল পার করিয়া দিয়া অচেতনের মত পড়িয়া আছে। আমি হোটেলের একজন বেহারাকে তার মাথায় বরফ দিতে বলিয়া আসিলাম। ব্যাপার কি জানিতে আসিয়াছি।"

মিসেস্ বসু বলিলেন, "মণিকা সুরেশকে বিবাহ করিবে না।"

বিস্ময়ের সহিত মিঃ রায় বলিলেন,—"কেন?"

আমার হৃদয়ের রক্ত-স্রোত খরবেগে প্রবাহিত হইল। এখনি কুমারী জীবনের যাহা গোপনীয় কথা তাহা বুঝি ব্যক্ত হইয়া যাইবে। তবু আমি নীরবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মিসেস্ বসু বলিলেন, "কেন আর তা কি বলিব, সুরেশের যেমন বুদ্ধি, নিজের বলিয়া অন্যের ফটো পাঠিয়েছিল, তাই দেখে মেয়েটির মন মুগ্ধ হইয়াছিল। এখানে আসিয়া সুরেশকে দেখে সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেছে।"

বিরক্তির সহিত মিঃ রায় বলিলেন, "সত্য সুরেশের এ ত ভারি অন্যায়।"

মিসেস্ বসু বলিলেন, "অন্যায় বলে অন্যায়! মায়ের যেমন বুদ্ধি। তাঁর ওই গুণধর ছেলের জন্য অমন সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়েটিকে পাঠিয়েছেন। আর সে টি-গার্ডেনের কথা যদি সব শুনিত?"

মিঃ রায় মৃদু কণ্ঠে বলিলেন, "তাই ত।"

মিসেস্ বসু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "এই ত ক মাস আগে মিস্ টমাস্‌কে বিয়ে করিবার জন্য পাগল হয়েছিল। তার বাপ মা কিছুতে মত দিলেন না, তাই হ'ল না। এদিকে ফিরিঙ্গীর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে বলে মা এমন সুন্দর মেয়েটিকে বলি দিতে পাঠিয়েছেন।"

মিঃ রায় বলিলেন, "সুরেশের ভারি অন্যায়। লিলি, তুমি মিস্ বসুকে পথ খরচ দাও নাই?"

মিসেস্ বসু বলিলেন, "ফিরিয়ে দিয়েছে।"

মিঃ রায় বলিলেন—সে কণ্ঠে যেন করুণার ধারা ছুটিল—"আহা বেচারা!"—

মিসেস্ বসু বলিলেন, "কালই চলে যাবে, বম্বে থেকে

আসবার সময় কা'র সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁদের ওখানেই যাবে।"

মিঃ রায় বলিলেন, "লিলি, কার ফটো সুরেশ পাঠিয়েছিল?"

মিসেস্ বসু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিলেন, "তোমার।"

আমি অর্দ্ধ অচেতনের মত সে স্থান হইতে সরিয়া আসিলাম, আমার হৃদয়ে যেন মৃত্যুবাণ ভেদ করিল।

কোন প্রকারে রাত্ কাটিয়া গেল। আমি সকালে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলাম। নয়টার সময় রিক্স আসিল, তাহার পূর্ব্বে মিসেস্ বসু আসিয়া বলিয়া গেলেন, সরকার ষ্টেসনে যাইবে, ও টিকিট ইত্যাদি করিয়া দিবে। আমি ধন্যবাদ দিয়া ষ্টেসনে চলিয়া আসিলাম। টিকিট করিয়া দিবার পর আমি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে বসিলাম, তখনো গাড়ী ছাড়িতে অনেক দেরি। আমি উদ্বিগ্ন হৃদয়ে বসিয়া রহিলাম, প্রথম ঘণ্টা দিবার পর আমি একবার বাহিরে চাহিলাম, দেখিলাম অদূরে মিঃ রায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমার দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি মিলিত হইল। সে দৃষ্টিতে শুধু গভীর করুণার লেখা অঙ্কিত দেখিলাম। তিনি সম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া নীরবে অভিবাদন করিলেন। লজ্জায় আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার মত হইল। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, সব ফুরাইয়া গেল। আর ইহ জীবনে দেখিবার বা দেখা হইবার কোন আশা রহিল না। দার্জ্জিলিংএর কোন ব্যক্তি আমায় জানে না, আমি কাহাকেও চিনি না। শুধু দুই দিনের জন্য যাওয়া আসা হইল। এখনো অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সুমিত্রা।

রবীন্দ্র বাবুর "রাজা ও রাণী" নাটকের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথাই শুনিয়াছি। যাঁহারা রবীন্দ্র-রচনার বড় পক্ষপাতী, তাঁহারা বলিয়াছেন, আজ কাল থিয়েটারের অধ্যক্ষদিগের ফরমাসেই অধিকাংশ নাটক রচিত হইয়া থাকে। সেই সকল নাটকের মধ্যে তরুণবয়স্ক দর্শকদিগের চিত্তরঞ্জনোপযোগী নাচ, গান ও হাসি, তামাসার যথেষ্ট আয়োজন থাকে। কিন্তু তন্মধ্যে সাহিত্য-রসজ্ঞ লোকদিগের মনোরঞ্জন করিবার উপযুক্ত মনোরম চিত্র-কৌশল ও কাব্যরসের উদ্দীপনা অতি অল্পই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য রঙ্গালয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যখন রমণীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সঙ্গীতে, নৃত্যে ও কথায় দর্শকবৃন্দের অন্তরে এক অভিনব মায়া-কুহক বিস্তার করে, তখন ঐ সকল নাটকের দৃশ্যগুলি তাঁহাদের চিত্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তারপর রঙ্গালয়ের সেই স্মৃতি লইয়া তাঁহারা যখন নাটকগুলি পড়িতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাদের কাছে বেশ ভালই লাগে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্যানুরাগী পাঠকের নিকট ঐ সকল নাটকের মূল্য অত্যন্ত অধিক নহে। সেই জন্য আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে "রাজা ও রাণী"কেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক বলিতে হইবে।

আবার যাঁহারা "রাজা ও রাণী" নাটকের তত্ত্ব পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারা বলিয়াছেন,—রবীন্দ্র বাবু গীতিকাব্য রচনায়ই অদ্বিতীয়; দৃশ্যকাব্য রচনায় কিম্বা কোন বৃহৎ চরিত্র অঙ্কনে তিনি চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার তত পরিচয় দিতে পারেন না। তিনি "রাজা ও রাণী" রচনায় সুমধুর কাব্যরসের অবতারণা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আশানুরূপ নাট্য-কৌশল প্রকাশ করিতে পারেন নাই; তাঁহার চরিত্র-সৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে অপূর্ণ এবং অস্বাভাবিক!

আমরা এই দুই পক্ষের তর্ক শুনিয়া সসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি, নাট্যশাস্ত্রে আমাদের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি নাই; সুতরাং "রাজা ও রাণীর" সূক্ষ্ম সমালোচনা করিতে আমরা অক্ষম। অনেক সময় দেখিতে পাই, একজন সুকণ্ঠ গায়ক তাহার স্বরলহরী সপ্তমে তুলিয়া গান গাহিতেছে; কিন্তু কোন কারণে দু এক জায়গায় তাল কাটিয়া যাইতেছে; সেই জন্য কালোয়াত বিচারকদিগের সে গান একটুকু ভাল বোধ হইতেছে না; অথচ সঙ্গীত

বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গ সেই সুমিষ্ট সঙ্গীতরস পান করিয়া পুলকিত হইতেছেন। তেমনি বড় বড় সমালোচকেরা "রাজা ও রাণী" গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রানুমোদিত কাব্যকলার অভাব দেখিয়া যতই ক্ষুণ্ণ হউন না কেন, আমরা অনেক অনভিজ্ঞ পাঠক এই গ্রন্থখানির কাব্য-সৌন্দর্য্যে ও বর্ণনামাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি। কেবল তাহাই নয়। এই নাট্যাঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে সুমিত্রা, ইলা ও কুমার সিংহের চিত্র বড় মনোরম বলিয়া মনে হইয়াছে। এই চিত্রগুলির আলোচনায় শুধু যে সৌন্দর্য্যস্পৃহাই চরিতার্থ হয়, তাহা নহে; ইহাতে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়; শিক্ষা লাভ করা যায় বলিয়াই আমরা সুমিত্রা-চরিত্র সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

সুমিত্রা জালন্ধর রাজ্যের রাণী,—রাজার নাম বিক্রম দেব। রাজার বিদ্যা আছে, বীর্য্য আছে, মহত্ত্ব আছে; —এক কথায় একজন মহৎপ্রকৃতিসম্পন্ন শক্তিশালী নৃপতির যাহা কিছু থাকা প্রয়োজন, তাহা সকলই আছে। কিন্তু তাহা থাকিলে হইবে কি? এক দোষেই সব মাটি! সে দোষ সম্বন্ধে রাজা স্বয়ংই বলিতেছেন,—

"অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তারে ভালবাসা; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল!"

রাণীর প্রতি এই যে "ভালবাসা", ইহাই রাজার অধঃপতনের কারণ। কিন্তু রাজা ইহাকে ভালবাসা বলিতেছেন, যথার্থই কি ইহা ভালবাসা? রাণী ত স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেছেন,—

"শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছি ছি মহারাজ,
একি ভালবাসা? এযে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব;"

বাস্তবিকই ইহা প্রকৃত ভালবাসা নয়,—রাণীর প্রতি মোহ ও অন্যায় আসক্তি মাত্র। কিন্তু রাজার প্রতি রাণীর যে সুগভীর প্রীতি, তাহাই যথার্থ ভালবাসা। রাণী সেই সুগভীর ভালবাসার জন্যই রাজার প্রীতিপূর্ণ আদরটুকু ও প্রণয়ের উচ্ছ্বাসপূর্ণ মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। শুধুই স্বামীর মিষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া থাকা ত লঘুপ্রকৃতির রমণীর কার্য্য। সুমিত্রা বুদ্ধিমতী, মনস্বিনী এবং শক্তিশালিনী রমণী; তাই তিনি রাজার কল্যাণ চাহেন, রাজ্যের কল্যাণ চাহেন; প্রকৃত সম্রাজ্ঞীর ন্যায় রাজকার্য্যে রাজার সাহায্য করিতে চাহেন এবং প্রজাদিগকে তিনি পুত্রবৎ জ্ঞান করেন। কিন্তু রাজা রাণীর প্রতি মোহে এমনই অন্ধ যে, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, মান, সম্পদ, গর্ব্ব ও পৌরুষ সকলই তুচ্ছ করিয়া, কেবলমাত্র রাণীর প্রীতির দ্বারাই অন্তরের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে চাহেন। কিন্তু তাহা কি কখনও সম্ভব? রাণী ত তাঁহার সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া অন্তরের নির্ম্মল প্রেম রাজার হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেন; রাজার অমিতস্পৃহা তাহাতে তৃপ্ত হইল কই? তৃপ্ত হইল না বলিয়াই তিনি সুমিত্রাকে রাণীর সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য ও গৃহের সমস্ত সংস্রব হইতে দূরে রাখিয়া, একমাত্র হৃদয়ের প্রীতির সীমার মধ্যে তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, প্রতিনিয়ত তাঁহার অন্তরের অমৃতরস পান করিতে চাহিতেন। সেই জন্য রাণী যখন গভীর প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া রাজাকে বলিতেন,—

"নিতান্ত তোমারি আমি,
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহ-কাজে—জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ।"

তখন রাজা কহিতেন,—

"থাক্ গৃহ, গৃহ-কাজ!
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি;
অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক পড়ে' বাহিরের কাজ!"

এই আসক্তির পরিণাম কি হইল? সূক্ষ্মদর্শী গীতাকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাই হইল। রাজা রাজকার্য্যের প্রতি একেবারেই দৃষ্টিপাত করিলেন না। রাণীর সন্তোষের জন্য তাঁহার পিতৃকুলের আত্মীয়দিগকে আহ্বান করিয়া